অনীশ দেব

দেখা যায় না শোনা যায়

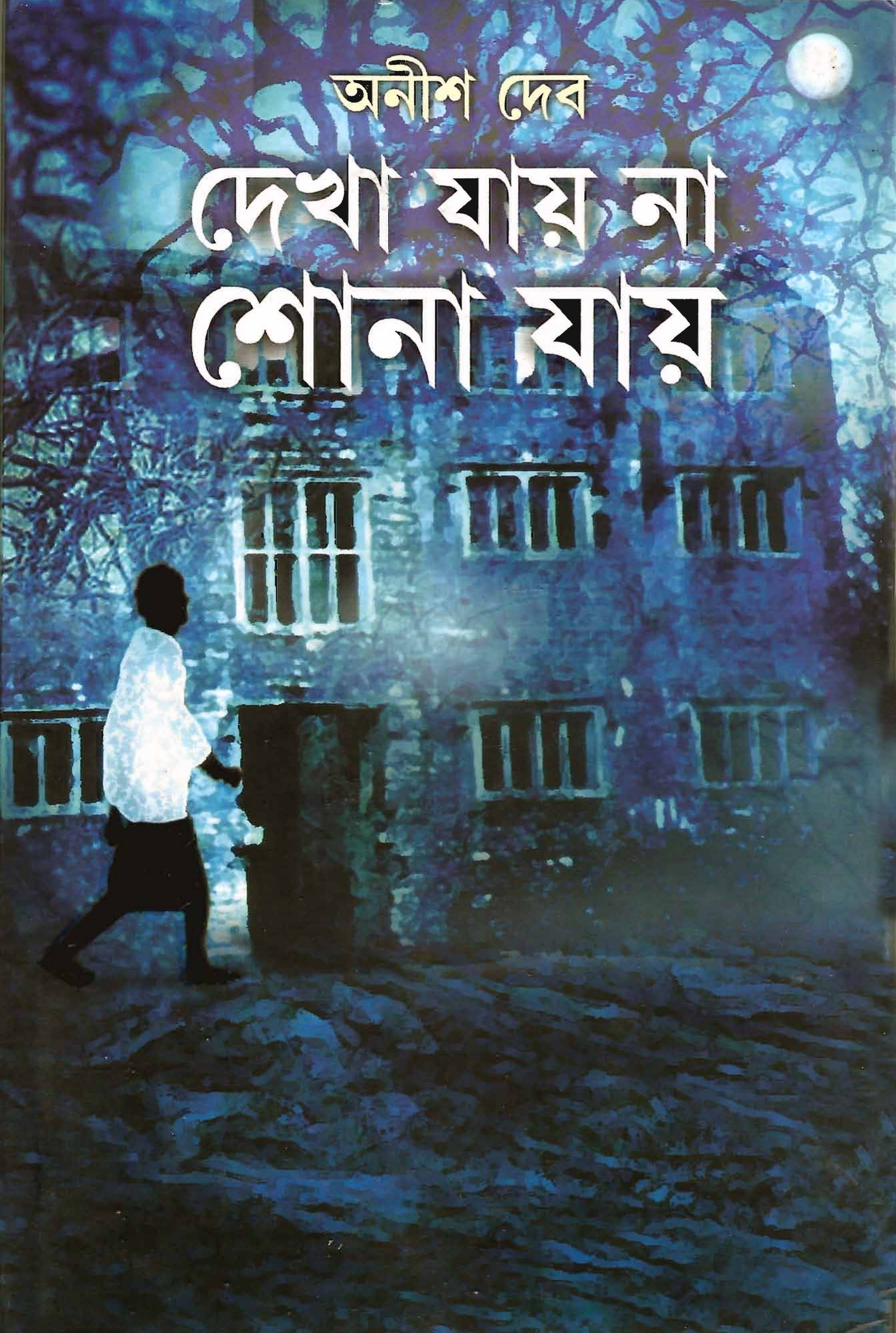

দেখা যায় না, শোনা যায়—নাকি শোনা যায় না, দেখা যায়? নাকি দুটোই?

এইসব প্রশ্নের উত্তর খুঁজতে ভূতশিকারি প্রিয়নাথ জোয়ারদার ছুটলেন চপলকেতু গ্রামে। যে-গ্রামে বিজলিবাতি এখনও ঢোকেনি। গ্রামের জমিদার পত্রলোচন সিংহ রায়।

রহস্যের শুরু 'রেনবো' চ্যানেলের একটা টেলিসিরিয়াল নিয়ে, যার নাম 'তেনারা যেখানে আছেন'। চ্যানেলের সাংবাদিক মিংকি তেওয়ারি, তৃষ্ণা আর ক্যামেরাম্যান বিনোদকুমারের সঙ্গে ভূতনাথ চপলকেতু গ্রামের দিকে রওনা হলেন। ওঁদের সঙ্গী হলেন কট্টর যুক্তিবাদী রমাশঙ্কর দত্ত।

তারপর?...

তার পর থেকেই শুরু হল ভয়ংকর সব ব্যাপারস্যাপার। রমাশঙ্কর প্রাণপণে বিজ্ঞান আর যুক্তি দিয়ে সেসব ঘটনার ব্যাখ্যা দিতে লাগলেন। পত্রলোচন সব দেখেশুনেও উদাসীন। ওঁর মতে, সবই 'ন্যাচারাল ফেনোমেনন'।

তাই যদি হবে, তা হলে চপলকেতু থেকে আচমকা উধাও হয়ে যাওয়া মানুষজন যাচ্ছে কোথায়? পুকুরের জল হঠাৎ-হঠাৎ দুলে ওঠে কেন? বাতাসে ভেসে বেড়ায় কেন অপদেবতার নিশ্বাস?...

অদ্ভুত বিষয় নিয়ে লেখা অদ্ভুত এক ভয়ের উপন্যাস 'দেখা যায় না, শোনা যায়'।

দেখা যায় না, শোনা যায়

অনীশ দেব

দেখা যায় না, শোনা যায়

পত্র ভারতী
www.bookspatrabharati.com

অধ্যাপক অশোককুমার গাঙ্গুলি

প্রিয়জনেষু

'দেখা যায় না, শোনা যায়'-এর প্রথম পর্ব কিশোর ভারতীর শারদীয়া ১৪১৮-তে প্রকাশিত হয়েছিল। পুজো সংখ্যায় অর্ধেক উপন্যাস প্রকাশ করার বকুনি হিসেবে এক পাঠক রসিকতা করে চিঠিতে জানিয়েছিলেন, 'এরকম দেখাও যায় না, শোনাও যায় না।' অপরাধ স্বীকার করে নিয়ে জানাই, উপন্যাসটির শেষ অংশ প্রকাশিত হয় এ বছরের কিশোর ভারতীর শারদীয়া ১৪১৯-এ।

বই প্রকাশের সময় উপন্যাসটি যথাসাধ্য পরিবর্ধন ও পরিমার্জন করেছি। শেষ পর্যন্ত কোথায় দাঁড়ালাম, সেটা বিচার করবেন আপনি—যিনি এখন বইটা হাতে নিয়ে এই ভূমিকা পড়ছেন।

সবশেষে ধন্যবাদ জানাই বন্ধু ত্রিদিবকুমার চট্টোপাধ্যায়কে, যিনি আমার 'ধারাবাহিক' অত্যাচার সহ্য করেছেন, হয়তো ক্ষমাও করেছেন। আর অনিতা রায় এ-বইয়ের শুধু প্রুফ দেখেননি, তার চেয়েও বেশি কিছু করেছেন। ওঁকে ধন্যবাদ।

১ ডিসেম্বর ২০১২
কলকাতা

অনীশ দেব

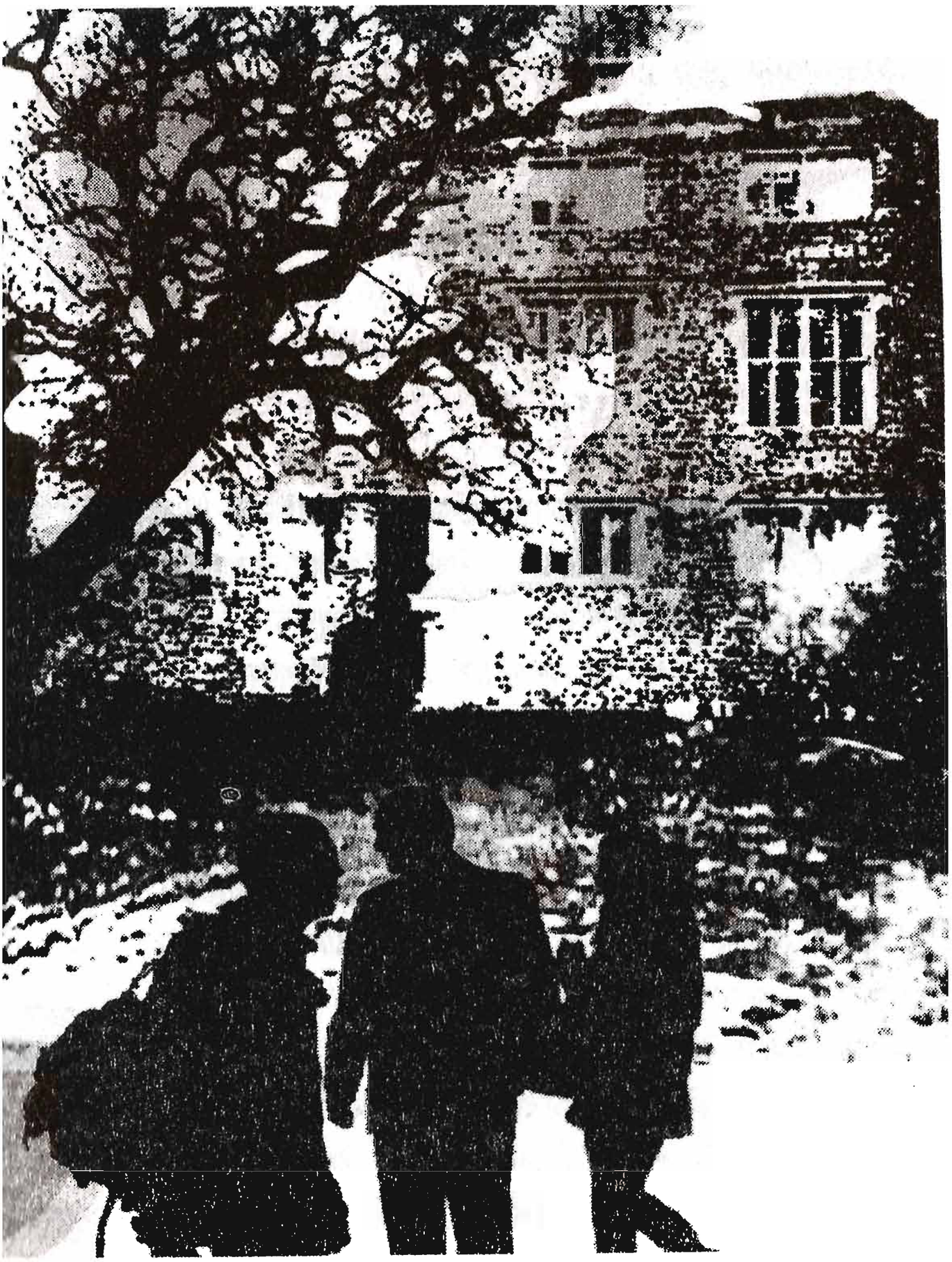

এক

টিভি-র 'রেনবো' চ্যানেলের একটা প্রোগ্রাম প্রিয়নাথ জোয়ারদারকে খুব টানে। প্রতি সপ্তাহে প্রিয়নাথ নিয়ম করে এটা দেখেন।

প্রোগ্রামটার নাম 'তেনারা যেখানে আছেন'। সারা ভারতে কোথায়-কোথায় ভূত-প্রেতের আস্তানা এবং সেখানে ঠিক কী ধরনের ভূতুড়ে ব্যাপার-স্যাপার ঘটে বলে স্থানীয় মানুষের বিশ্বাস, সেসব নিয়েই জমকালো রুদ্ধশ্বাস প্রেজেন্টেশান।

এই উইকলি প্রোগ্রামটা দেখার সময় প্রিয়নাথ নোটবই আর পেন নিয়ে বসেন। যখনই মনে হয় তখনই নিজের মতো করে নোট নেন। আর তারই ফাঁকে-ফাঁকে সিগারেটে টান।

প্রোগ্রামটার ভৌতিক ব্যাপারগুলোও ভারী বিচিত্র।

তামিলনাড়ুর কোন গ্রামে নাকি একটা বটগাছ রাতে কথা বলে, ভবিষ্যদ্বাণী করে। লখনউয়ের কোন এক রাস্তায় একটা বিশেষ জায়গায় গিয়ে টাঙ্গা সবসময় উলটে যায়।

উড়িষ্যার একটা পোড়োবাড়ির সামনে রাতে যদি কেউ যায় তা হলে শোঁ-শোঁ শব্দে বাতাসের ডাক শুনতে পায় আর তার সঙ্গে সমুদ্রের ঢেউ ভাঙার শব্দ। যদিও সমুদ্র সেখান থেকে সাড়ে

চার কিলোমিটার দূরে।

বিহারের একটা রাজপ্রাসাদের মাপের প্রকাণ্ড বাড়ি নাকি ভারী অদ্ভুত। বহুযুগের পুরোনো ভাঙাচোরা ফাটল-ধরা ওই বাড়িটা থেকে প্রায়ই নানান অংশ খসে পড়ে। সেই খসে পড়া টুকরোগুলোর চেহারা মানুষের। মানে, এক-একটা টুকরো এক-একটা ভাস্কর্য— মানুষের নানান ভঙ্গিমার মূর্তি।

আজও রাত ন'টায় টিভি খুলে 'রেনবো' চ্যানেল চালিয়েছেন। মনোযোগী ছাত্রের মতো নোট নিচ্ছেন, সিগারেটে টান দিচ্ছেন, তখনই পাশের টেবিলে রাখা মোবাইল ফোন বেজে উঠল।

সিগারেট বাঁ-হাতে নিয়ে ডানহাতে ফোন তুললেন প্রিয়নাথ। 'অ্যাকসেপ্ট' বোতাম টিপলেন।

'হ্যালো, প্রিয়নাথ বলছি—।'

'ভূতনাথদা? আমি মিংকি—।'

অমনি গলার স্বর পালটে গেল প্রিয়নাথের ঃ 'বলো, কী খবর? ঘরে বসে তোমাদের "তেনারা" প্রোগ্রামটা দেখছি...।'

মিংকি তেওয়ারি 'রেনবো' চ্যানেলের সাংবাদিক। 'তেনারা যেখানে আছেন' প্রোগ্রামটার কনসেপ্ট ওরই। তা ছাড়া এই প্রোগ্রামটা মিংকি আর ওর দুজন কলিগ মিলে প্রোডিউস করছে।

প্রিয়নাথ মিংকিকে প্রায় বছর চারেক ধরে চেনেন। চব্বিশ-পঁচিশের মিষ্টি মেয়ে। খুব চনমনে আর এনার্জিটিক। গত দু-বছরে দুবার ভূতনাথের টিভি ইন্টারভিউ নিয়েছে। প্রথম ইন্টারভিউর পর থেকেই আলাপটা গাঢ় হয়ে গেছে।

প্রিয়নাথ নিজে যখন পঁচিশ কি ছাব্বিশ, তখন থেকেই ভূতচর্চায়

মেতেছেন। ভূত-প্রেতের খোঁজ করে-করে তিন দশকের বেশি সময় কাটিয়ে দিয়েছেন। তাই সময়ের সঙ্গে-সঙ্গে কী করে যেন ওঁর শৌখিন নামটা পালটে গিয়ে 'ভূতনাথ' হয়ে গেছে। ওঁর কাছের মানুষরা ওঁকে সবসময় ভূতনাথ বলে ডাকে। মিংকিও তাই।

'মিংকি, তোমার প্রোগ্রাম কিন্তু দারুণ হচ্ছে। একইসঙ্গে ইন্টারেস্টিং আর ইনফরমেটিভ। দেখবে, তোমার "তেনারা" তাঁদের টি-আর-পি চড়াতে-চড়াতে কোথায় নিয়ে যান! কনগ্রাট্‌স, মিংকি...!'

প্রিয়নাথ একতরফা কথা বলে যাচ্ছিলেন। হঠাৎই যেন খেয়াল করলেন মিংকি বেশ চুপচাপ, অথচ মেয়েটা অনেক কথা বলে, দারুণ কথা বলে।

'কী ব্যাপার, মিংকি?' প্রিয়নাথের গলায় উদ্‌বেগ।

'আর ব্যাপার—' ফোঁস করে একটা শ্বাস ছাড়ল মিংকি : 'ভূতনাথদা, আমার প্রোগ্রামের টি-আর-পি জিরো হতে চলেছে। কেন কি, বোধহয় নেক্সট উইক থেকে প্রোগ্রামটাই আমাদের প্রোডাকশন হাউস বন্ধ করে দেবে।'

'কেন? কেন?' হাতের সিগারেটটা অ্যাশট্রেতে গুঁজে দিলেন। টিভির প্রোগ্রামের দিক থেকে চোখ সরে গেল।

'কেন আবার! কলকাতার একটা র‍্যাশনালিস্ট সোসাইটি—নাম "যুক্তিবাদ প্রসার সমিতি"—তার সেক্রেটারি বেশ ভালোরকম থ্রেট দিয়ে আমাদের চ্যানেলে একটা চিট্‌ঠি দিয়েছে। তাতে লিখেছে কি যদি আমরা এই প্রোগ্রামের সাপোর্টে কোনও প্রুফ না দিতে পারি, তা হলে পাবলিককে ব্লাফ দেওয়ার জন্যে, মিসলিড করার জন্যে,

সাদা কথায় বোকা বানানোর জন্যে সে কোর্ট থেকে ইনজাংশান অর্ডার বের করবে, কোর্টে কেস ঠুকবে।

'আমাদের চ্যানেলের ডিরেক্টার আমাকে ডেকে বলেছেন, সাপোর্টিং প্রুফ খুঁজে বের করতে। এবং জলদি বের করতে। সো ভূতনাথদা, প্লিজ সেভ মি। য়ু ফাইন্ড আউট সাম ব্লাডি প্রুফ ফর মি। যেমন করে হোক এই প্রসার সমিতিকে ঠেকান।'

শেষদিকে মিংকির কথাগুলো আর্ত অনুনয়ের মতো শোনাল।

ভূতনাথের খুব খারাপ লাগছিল। ভূত আছে কি নেই, এই প্রশ্নের উত্তর নিয়ে সংশয় অসংশয়ের দোলা চিরকালের। এই প্রশ্নের উত্তরে ভূতনাথ যেটা বলেন সেটা হল ঃ ভূত হল ছোটবেলায় পড়া জ্যামিতিক বিন্দুর সংজ্ঞার মতো। বিন্দুর দৈর্ঘ্য, প্রস্থ বা বেধ নেই, কিন্তু অবস্থিতি আছে। অর্থাৎ, মাপা না গেলেও তার অস্তিত্ব আছে। তেমনি বিজ্ঞান বা যুক্তি দিয়ে মাপা না গেলেও ভূতের অস্তিত্ব আছে।

'যুক্তিবাদ প্রসার সমিতি'-র ওই সম্পাদক বিজ্ঞান আর যুক্তি দিয়ে মেপেই প্রমাণ করতে চান যে, ভূত বলে কিছু নেই!

মনে-মনে হাসলেন প্রিয়নাথ। যুক্তিবাদের গুরুমশাই ওই সম্পাদকের সঙ্গে দেখা হলে প্রিয়নাথ সবিনয়ে জানতে চাইবেন, ভগবানের অস্তিত্ব প্রমাণের জন্য বিজ্ঞানসম্মত কোনও মহান কায়দা তাঁর জানা আছে কি না।

'ওকে, মিংকি—তুমি একটা কাজ করো। কাল সকাল এগারোটা নাগাদ তুমি আমার বাড়িতে আসতে পারবে?

'অফ কোর্স পারব!' তড়িঘড়ি বলে উঠল মিংকি, 'ডিরেক্টারকে

খুশ না করতে পারলে আমাকে অন্য চ্যানেলে নোকরির জন্যে লাইন লাগাতে হবে। কাল এগারোটাতেই আসব। শার্প।'

'তা হলে শোনো, তুমি সঙ্গে কী-কী নিয়ে আসবে। তোমার প্রোগ্রামটার সবক'টা এপিসোডের ডিভিডি—যেগুলো টেলিকাস্ট হয়েছে সেগুলো, আর যেগুলো এখনও টেলিকাস্ট হয়নি, কিন্তু হবে—সেগুলোও। মানে, টোটাল সিরিজটার ডিভিডি নিয়ে আসবে।'

'ওকে। আর কী আনব বলুন—?'

'ওই র‍্যাশনালিস্ট সোসাইটির সেক্রেটারির চিঠির একটা জেরক্স কপি—ব্যস, আর কিছু লাগবে না।'

'ওঃ, খুব হালকা লাগছে। ভূতনাথদা, থ্যাংক য়ু সো মাচ। সি য়ু টুমরো—।'

ফোন ছেড়ে দিল মিংকি।

প্রিয়নাথ আবার 'তেনারা যেখানে আছেন' প্রোগ্রামটায় মনোযোগ দিলেন।

প্রোগ্রামটায় যথেষ্ট মেটিরিয়াল আছে। এটার জন্য মিংকিরা প্রচুর হোমওয়ার্ক করেছে, লেগওয়ার্ক করেছে, বাড়াবাড়িরকমের খেটেছে। প্রতিটি এপিসোডের ভুতুড়ে জায়গায় গিয়ে অন লোকেশান শুট করেছে, লোকাল লোকজনের বাইট নিয়েছে। তারা কথা বলেছে যার-যার নিজের ভাষায়। কিন্তু মিংকিদের প্রোগ্রামে সেইসব কথার বাংলা অনুবাদ টিভির পরদায় পাশাপাশি ফুটে উঠেছে, তারপর ধীরে-ধীরে স্ক্রোল করে গেছে। আর তার সঙ্গে সিনক্রোনাইজ করে অফ-ভয়েস কমেন্ট্রি।

নাঃ, মানতেই হবে, মিংকিদের প্রোগ্রামটা বেশ কনভিন্সিং। আর

সেইজন্যই তো প্রিয়নাথ জোয়ারদার সেই প্রোগ্রাম দেখে নিয়মিত নোট নেন!

প্রোগ্রামটা শেষ হয়ে গিয়েছিল। তার জায়গায় অন্য একটা সিরিয়াল শুরু হয়ে গেছে। প্রিয়নাথ আনমনা হয়ে টিভির পরদার দিকে তাকিয়ে রইলেন। অথচ কিছুই দেখছিলেন না। ওঁর মাথায় মিংকির সমস্যাটা ঘুরে বেড়াচ্ছিল। মনে-মনে তার একটা সমাধান খুঁজে বেড়াচ্ছিলেন।

দুই

ঠিক এগারোটায় কলিংবেলের টুং-টাং শব্দ হল।

প্রিয়নাথ একটা বই পড়ছিলেন ঃ ডাড্‌লি রাইটের লেখা 'দ্য বুক অফ ভ্যাম্পায়ার্‌স'। ১৯২৪ সালে ছাপা সেকেন্ড এডিশান। কলিংবেলের শব্দ পেয়ে হাতের বইটা বন্ধ করলেন।

দরজা খুলতেই সামনে মিংকি তেওয়ারি। হাতে একটা বড়সড়ো প্লাস্টিকের প্যাকেট।

ফরসা, বয়কাট চুল, ছোট অথচ টানা চোখ, নাক একটু ছড়ানো, চোখের কোণে হাসির ছোঁয়া। সবমিলিয়ে বেশ সুন্দর দেখতে।

মিংকির পায়ে ব্লু জিন্‌স। গায়ে হালকা ব্লু টপ—রাউন্ড নেক, এবং বেশ আঁটোসাটো। টপের ওপরে কায়দা করে গাঢ় নীল রঙে লেখা ঃ আই অ্যাম নট ফর সেল।

ওর বাঁ-হাতে একটা সিনথেটিক ব্যাঙ্গল আর কানে হোয়াইট মেটালের দুটো ফুল।

'এসো, ভেতরে এসো—।' ওকে স্বাগত জানালেন প্রিয়নাথ।

প্রিয়নাথের আস্তানা উত্তর কলকাতার রাজা নবকৃষ্ণ স্ট্রিটের একটা পুরোনো বাড়িতে। মিংকি এ-বাড়িতে আগে অনেকবার এসেছে। তাই প্রিয়নাথের ড্রয়িংরুমের ছন্নছাড়া চেহারা ওর ভালো করেই চেনা।

'ব্যাচিলার্স ডেন' বলতে যা বোঝায় ঘরটা চরিত্রে ঠিক তাই।

একদিকের দেওয়ালে গাদা-গাদা বই ঠাসা। সেই তাক 'হাউসফুল' হয়ে যাওয়ায় বই এসে জড়ো হয়েছে একটা টেবিলে, টেবিল থেকে চেয়ারে, আর সবশেষে মেঝেতে।

একটা পুরোনো সোফার এক কোণে প্রিয়নাথ বসেছিলেন। পরনে বাদামি-সাদা স্ট্রাইপড্ হাফশার্ট আর সাদা পাজামা। ডাড্‌লি রাইটের বইটা মাঝ-পাতায় উপুড় করে সোফায় রেখেছেন। মিংকিকে সোফার অন্য কোণটা দেখিয়ে বললেন, 'বোসো, মিংকি। যতটা পারো কমফোর্টেব্‌ল হও।'

মিংকি চটপট গিয়ে সোফায় বসে পড়ল। হাতের প্যাকেটটা পাশে রাখল। ঘরের দেওয়ালে, টেবিলে, চেয়ারে আর মেঝেতে আশ্রয় নেওয়া বইয়ের সমুদ্রের দিকে তাকিয়ে বলল, 'ভূতনাথদা, ভূত ধরার কাজটা খুব পেইনফুল, না? এত্ত বই পড়তে হয়! নোবডি উইল বিলিভ ইট...।'

প্রিয়নাথ ছোট্ট করে হাসলেন। বললেন, 'সব কাজই পেইনফুল, মিংকি। নো পেইন, নো গেইন...।'

মিংকি খিলখিল করে হেসে ফেলল, বলল, 'ওয়েল সেইড।'

ওর দিকে তাকিয়ে প্রিয়নাথের একটা গানের লাইন মনে পড়ল ঃ 'আমি চঞ্চল ঝরনাধারা...।'

মিংকিকে সামনাসামনি কিংবা টিভিতে যখনই দেখেন তখনই মনে হয় ওর 'জাগিয়া উঠেছে প্রাণ'। কিন্তু আজ ঝরনাধারার গতি কিংবা প্রাণ জেগে ওঠার তেজ বেশ স্তিমিত বলে মনে হল।

ওকে একটু বসতে বলে প্রিয়নাথ ভেতরের ঘরে গেলেন। একটু পরেই একটা প্লেটে দুটো সন্দেশ আর একগ্লাস জল নিয়ে এলেন। একটা টি-টেবিলের ওপরে প্লেট আর গ্লাস রেখে টেবিলটা টেনে এগিয়ে দিলেন মিংকির কাছে। বললেন, 'খেয়ে নাও। ঠাকুরের প্রসাদ—।'

মিংকি একবার ভূতনাথের মুখের দিকে তাকাল শুধু। ও জানে এই অদ্ভুত মানুষটা আত্মা এবং প্রেতাত্মা—দুটোকেই বিশ্বাস করে। ঠাকুরের পুজোপাঠ ওর রোজকার নিয়ম। তার সঙ্গে ভূত-প্রেতচর্চাও।

সন্দেশ দুটো খেতে-খেতে বাঁ-হাতে প্লাস্টিকের প্যাকেটটা প্রিয়নাথের দিকে এগিয়ে দিল মিংকি। জড়ানো গলায় বলল, 'চারটে ডিভিডি আছে। সিরিয়াল নাম্বার দেওয়া আছে। আর ওই র‍্যাশনালিস্ট লোকটার চিঠির কপি—।'

প্রিয়নাথ প্যাকেটের ভেতরে উঁকি মেরে দেখলেন। তারপর হাত ঢুকিয়ে চিঠিটা বের করে নিলেন। প্যাকেটটা পাশে রেখে চিঠিটা পড়তে শুরু করলেন।

মিংকি তখন জলের গ্লাস শেষ করে প্রিয়নাথের ঘরটাকে

খুঁটিয়ে-খুঁটিয়ে দেখছিল।

জোড়াতালি দেওয়া ড্যাম্প ধরা দেওয়াল। তার সাদা রঙের আস্তর অনেক জায়গা থেকেই খসে পড়েছে। ঘরের সিলিং-এ কড়ি-বরগা—লোহা আর কাঠের তৈরি। কোথাও-কোথাও রং চটে গিয়ে লোহায় জং ধরে গেছে। সেই ব্যাকগ্রাউন্ডে পুরোনো বুড়ো সিলিং ফ্যানটাও দিব্যি মানিয়ে গেছে।

যে-সোফাটায় মিংকি বসে আছে তার ঠিক মুখোমুখি একটা রঙিন এলসিডি টিভি। আর তার পাশে একটা পুরোনো জমকালো স্টাইলের খাটো আলমারি—পালিশ করা কাঠ দিয়ে তৈরি এবং তার পাল্লায় একটা আয়না বসানো।

ঘরটা থেকে কেমন যেন একটা পুরোনো-পুরোনো গন্ধ বেরোচ্ছিল—ন্যাপথালিন, ব্লিচিং পাউডার আর বাঁধাকপি সেদ্ধর গন্ধ মেশানো।

মিংকি বলল, 'ঘরটার একটু ফেস লিফ্‌ট করাতে পারেন না! কেমন ব্যাকডেটেড...পুরোনো...। এখানে ভূত-টুত থাকলে আমাদের প্রোগ্রামটায় দিব্যি ফিট করে যেত।'

'উঁ?' বলে চিঠিটা থেকে মুখ তুললেন প্রিয়নাথ। একটু হেসে বললেন, 'দ্যাখো, মিংকি— এ-ঘরে একমাত্র ওই টিভি আর ডিভিডি প্লেয়ার ছাড়া সবই বেশ পুরোনো। তার মধ্যে এই লোকটাও কিন্তু আছে—' বলে নিজের বুকে বুড়ো আঙুল ঠুকলেন।

'পুরোনো' লোকটাকে খুঁটিয়ে দেখল মিংকি।

কপালটা ওপরদিকে বাড়তে-বাড়তে বেশ বড়সড়ো টাকের চেহারা নিয়েছে। তার দুপাশে, কানের ওপরটায়, কয়েক খাবলা

চুল—কাঁচা-পাকা। চোখে মোটা ফ্রেমের চশমা। তার ঠিক ওপরেই কপালে কয়েক লাইন স্থায়ী ভাঁজ। কান দুটো মাপে বেশ বড়। নাকটাও খড়্গ টাইপের।

প্রিয়নাথ জোয়ারদারের চেহারা এমনিতে ফরসা, সৌম্যকান্তি। তবে তারই মধ্যে ব্যক্তিত্বের জোরটা কীভাবে যেন স্পষ্ট ফুটে উঠেছে। বয়েস ষাটের কাছাকাছি হলেও চেহারা আর স্বাস্থ্য দেখে অনেকটা কম বলে মনে হয়।

'টিভি আর ডিভিডি প্লেয়ারটা নতুন কেন? আগের টিভিটা কোথায় গেল?' ঘাড় বাঁকিয়ে জেদি মেয়ের গলায় জানতে চাইল।

'নতুন তার কারণ পুরোনো বেঢপ টিভিটা দেড়মাস আগে খারাপ হয়েছে বলে। আর আমার কাজের জন্যে ডিভিডি প্লেয়ার ছাড়া বড্ড অসুবিধে হচ্ছিল। যেমন, এই তোমার প্রবলেমটাই ধরো না—' বাঁ-হাতটা শূন্যে নাড়লেন প্রিয়নাথ ঃ 'যাকগে, এসব গোয়েন্দা-মার্কা কোশ্চেন বাদ দাও। এখন বলো তো, এই র‍্যাশনালিস্ট সোসাইটির সেক্রেটারির হুমকির ব্যাপারটা কী করবে?'

'ও মাই গড! আমি কী করব? করবেন তো আপনি—' চোখ বড়-বড় করে বলল মিংকি।

'ও—' চিঠিটা হাতে নিয়ে চোখ বুজলেন প্রিয়নাথ। ভাবনার মধ্যে ডুবে গেলেন কিছুক্ষণ।

তারপর চোখ খুলে তাকালেন চিঠিটার দিকে। র‍্যাশনালিস্ট সোসাইটির লেটারহেডে ছাপা চিঠি। বেশ জঙ্গি ভাষায় লেখা। নীচে সই রয়েছে এবং লেখকের নামও ছাপানো আছে ঃ রমাশঙ্কর দত্ত।

'এই রমাশঙ্কর দত্ত লোকটা কীরকম?'

'আমার একদম পছন্দ নয়—' ঠোঁট ওলটাল মিংকি ঃ 'কথাবার্তা বলে খুব বাজে ভাবে। মনে লাগে কি আমার বসের চেয়েও বড় কর কুছ। খালি হুকুম আর হুমকি...।'

'মিংকি, চিঠিটা পড়ে আমার মনে হচ্ছে এর হুমকিগুলো ফাঁকা আওয়াজ নয়। সত্যি-সত্যি যদি তুমি সাপোর্টিং প্রুফ জোগাড় করতে না পারো তা হলে তোমার প্রোগ্রাম ও শিকেয় তুলবে।'

'শিকেয় তুলবে?' অবাক হয়ে ভূতনাথের দিকে তাকাল মিংকি ঃ 'শিকেয় মানে কী?'

হেসে ফেললেন প্রিয়নাথ। 'শিকেয়' শব্দটার অর্থ মিংকি তেওয়ারি বুঝতে পারেনি। তাই খোলসা করে বললেন, 'প্রুফ জোগাড় করতে না পারলে তোমার প্রোগ্রামের চ্যাপ্টার ক্লোজ্‌ড হয়ে যাবে।'

মিংকি একটু গম্ভীর হয়ে গেল। তারপর হঠাৎই আশা ভরা চোখে তাকাল ভূতনাথের দিকে। এক ঝলক হেসে বলল, 'আপনি তো প্রুফ জোগাড় করে দিচ্ছেন! এ ব্যাপারে আপনি ফেমাস। য়ু আর দ্য গ্রেটেস্ট।'

প্রিয়নাথ একটু হাসলেন। কিন্তু মনে-মনে তখনও নানান কথা ভাবছিলেন, সমস্যা সমাধানের একটা পথ খুঁজছিলেন।

'আচ্ছা, মিংকি, তোমাদের এই প্রোগ্রামটায় কলকাতা বা ওয়েস্ট বেঙ্গলের কোনও ভূতুড়ে বাড়ি-টারি দেখানো হয়নি?'

'আছে, তবে এখনও টেলিকাস্ট হয়নি। পসিব্‌লি তিন-চারটে এপিসোড পরে আছে।'

'গুড। সেটাই হবে আমাদের ফোকাস।' প্রিয়নাথ চিঠিটা শূন্যে

দুবার নাড়লেন। তারপর ঃ 'আমি কাল রাতের মধ্যে সবক'টা এপিসোড দেখে রাখছি। তারপর তোমাকে ফোন করে আমার ওপিনিয়ান দেব।'

'কিন্তু আপনি কি কোনও লাইন অফ অ্যাকশান ভেবেছেন?'

চিঠিটা সোফায় নামিয়ে রেখে ভূতনাথ বললেন, 'ভেবেছি। ওয়েস্ট বেঙ্গলের যে-এপিসোডটা তোমার সিরিয়ালে আছে সেটা আমি ইনভেস্টিগেট করে দেখব। যদি প্রুভ করতে পারি যে, ব্যাপারটা জেনুইন তা হলে তুমি জিতবে, রমাশঙ্কর হারবে। আর যদি ভূত-প্রেতরা আমাকে দেখা না দেয় তা হলে ব্যাড লাক। রমাশঙ্কর উইন্‌স—য়ু লুজ।'

'ইমপসিব্‌ল। কারণ, আমাদের চ্যানেলের টিম খুব জেনুইন। ওরা খুব অনেস্টলি কাজ করেছে। তা ছাড়া "রেনবো" এই প্রোডাকশানটার জন্যে বহুত পয়সা ইনভেস্ট করেছে—।' ব্যাপারটা জোর দিয়ে বোঝানোর জন্য বাতাসে হাত নাড়ল মিংকি ঃ 'আমি বলছি আপনি প্রুভ করতে পারবেন।'

প্রিয়নাথ গম্ভীরভাবে ঘাড় নাড়লেন। ছোট্ট করে বললেন, 'হুঁ—।'

'আমি তা হলে আপনাকে কবে ফোন করব?' প্রশ্নটা করেই উঠে দাঁড়াল মিংকি।

প্রিয়নাথ তড়িঘড়ি হাত নেড়ে ওকে বললেন, 'আরে, উঠছ কী? বোসো, বোসো। তোমাকে আমি চা করে খাওয়াব...।'

'না, ভূতনাথদা—' পকেট থেকে মোবাইল বের করে সময় দেখল ঃ 'অফিসে ঢুকতে দেরি হয়ে যাবে...।'

প্রিয়নাথ বললেন, 'ডোন্ট ফরগেট, তুমি এখানে অফিসের কাজেই এসেছ। তা ছাড়া তোমার জন্যে চা করলে আমিও বাদ যাব না। আর তা হলেই একটা সিগারেট ধরানোর চান্স পাব—।'

'ওঃ, আপনার এই হ্যাবিটটাই বহুত বাজে। সিগারেট। আপনি জানেন না, সিগারেট স্মোক করাটা ইনজুরিয়াস টু হেল্‌থ?'

'হ্যাঁ, জানি।' হেসে বললেন ভূতনাথ, 'আর সিগারেটের মতো ভূত ধরে বেড়ানোটাও তো স্বাস্থ্যের পক্ষে ক্ষতিকর! কিন্তু মিংকি, বিলিভ মি; এ-দুটোর কোনওটাই আমি ছাড়তে পারব না। আই লাভ দেম...।'

তিন

জায়গাটার নাম চপলকেতু। এরকম নামের যে কোনও জায়গা হতে পারে সেটাই প্রিয়নাথ জানতেন না। এপিসোডের শুরুতেই বড় করে টাইটেল দেখা গেল পরদায় ঃ 'চপলকেতুর চপল ছায়া'। তার নীচেই মাঝারি হরফে লেখা ঃ 'পশ্চিমবঙ্গ'।

সন্ধেবেলা পুজোপাঠ সেরে টিভির সামনে বসেছেন ভূতনাথ। ওঁর পাশেই একটা ছোট টেবিলে টেবিল-ল্যাম্প জ্বলছে। টেবিল-ল্যাম্পের হলুদ ঘেরাটোপে লাল বুটির নকশা।

টেবিল-ল্যাম্পের এই আলোটুকু ছাড়া ঘর অন্ধকার। ডিভিডি প্লেয়ারে মিংকি তেওয়ারির দিয়ে যাওয়া ডিভিডি চলছে।

পশ্চিমবঙ্গের এপিসোডটা আরও একবার দেখছেন। হাতে প্যাড আর ডট পেন।

মিংকির দেওয়া চারটে ডিভিডি-ই প্রিয়নাথের দেখা হয়ে গেছে। সেই সকাল ন'টা থেকে দেখা শুরু করেছেন। মাঝে-মাঝে ব্রেক দিয়ে স্নান, খাওয়াদাওয়া সেরে নিয়েছেন। তারপর সব ক'টা এপিসোড দেখে শেষ করতে-করতে দুপুর সওয়া দুটো।

এপিসোডগুলো খুবই প্রফেশনালি তোলা। যেমন স্মার্ট ডায়রেকশান, তেমনই স্মার্ট সিনেমাটোগ্রাফি। এই এপিসোডগুলোকে জুড়ে এডিট করে খুব সহজেই বড় পরদার জন্য একটা দারুণ ছবি তৈরি করে ফেলা যায়।

দুপুরে পশ্চিমবঙ্গের এপিসোডটা দেখেছেন সাধারণ দর্শকের চোখে। এখন সেটা আবার দেখতে বসেছেন ভূতশিকারির চোখে।

এপিসোড শুরু হওয়ার পর থেকেই ধারাভাষ্য শুরু হয়ে গেল। কখনও সেটা মহিলার গলায়, কখনও-বা পুরুষের।

জায়গাটা একটা গণ্ডগ্রাম। বর্ধমান কর্ড লাইনের শিবাইচণ্ডীতে নেমে ভেতরদিকে আরও ন'-দশ কিলোমিটার যেতে হয়।

শুরুতে জায়গাটার নানান অংশের ফটোগ্রাফ মিক্স করে-করে দেখানো হচ্ছিল—সঙ্গে ব্যাকগ্রাউন্ড এফেক্ট মিউজিক। সবমিলিয়ে গা-ছমছমে পরিবেশটা বেশ জমে উঠল।

তারপরই পরদা জুড়ে একটা রঙিন ম্যাপ দেখানো হল—পশ্চিমবঙ্গের ম্যাপ। সেই ম্যাপে দুটো বড়-বড় সিঁদুরের টিপ ঃ একটা কলকাতা, আর একটা চপলকেতু। একটা চওড়া লাল রেখা কলকাতা থেকে চপলকেতু যাওয়ার রাস্তাটা আঁকতে শুরু করল,

আর তার সঙ্গে চলতে লাগল সেই রাস্তা ধরে যাওয়ার খুঁটিনাটি বিবরণের ধারাভাষ্য। শুনলেই বোঝা যায়, ওই রাস্তা ধরে সত্যিকারে না গেলে এরকম বর্ণনা দেওয়া সম্ভব নয়।

রাস্তার পরিচয় শেষ হল আর তার সঙ্গে-সঙ্গে ক্যামেরাও ঢুকে পড়ল গ্রামে। ট্রাভেল এজেন্সির প্রোগ্রামের মতো গ্রামের নানান জায়গা দেখানো হল, 'অফ্ ভয়েস'-এ দর্শককে তার সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেওয়া হল। তারপর সাংবাদিক মেয়েটিকে দেখা গেল— মাইক হাতে একটা পুরোনো মন্দিরের সামনে দাঁড়িয়ে রয়েছে। জানা গেল, মেয়েটি 'রেনবো' চ্যানেলের তৃষ্ণা। এই ভাঙাচোরা মন্দির— অথবা, মন্দিরের ধ্বংসাবশেষ থেকেই ওর ভূতুড়ে আস্তানার অভিযান শুরু।

প্রিয়নাথ প্রোগ্রামটা দেখছিলেন আর চায়ের কাপে চুমুক দিচ্ছিলেন। আবার কখনও-কখনও টেবিল-ল্যাম্পের আলোয় প্যাডের কাগজে নোট নিচ্ছিলেন।

টেবিল-ল্যাম্পের পাশে ওঁর মোবাইল ফোন সাইলেন্ট মোডে রাখা ছিল। মাঝে-মাঝে ওটার আলো দপদপ করে উঠছিল, কিন্তু প্রিয়নাথ সেদিকে এখন তাকাচ্ছিলেন না। পরে সময়মতো দেখবেন, দেখে দরকারি যোগাযোগগুলো সেরে নেবেন।

তৃষ্ণা ছাড়াও আরও দুজন সাংবাদিককে ছবিতে দেখা গেল। প্রোগ্রামটার একঘেয়েমি কাটাতেই হয়তো তিনজন সাংবাদিককে ব্যবহার করা হয়েছে। ওরা ফটোগ্রাফারদের নাম বলছিল, কিন্তু তাদের দেখা যাচ্ছিল না। প্রিয়নাথ সবার নামই টুকে নিলেন। তার সঙ্গে এপিসোডে দেখানো জায়গাগুলোও নোট করে নিলেন।

এপিসোডটা সত্যিই বেশ অদ্ভুত। মিংকিরা যা-যা দেখিয়েছে সেগুলো যদি সত্যি হয় তা হলে মানতেই হবে, চপলকেতুর এই অঞ্চলটা বিচ্ছিরিরকম ভূতুড়ে।

এটা ঠিকই যে, ভৌতিক কাণ্ডকারখানাগুলো তৃষ্ণাদের চোখের সামনে ঘটেনি, আর ওদের ক্যামেরাও চলেছে শুধু দিনেরবেলায়। স্থানীয় লোকজন কোনও-কোনও ঘটনা আবছাভাবে বর্ণনা করেছে। তৃষ্ণারা সেসব কথা রেকর্ড যেমন করেছে তেমনই স্পেশাল এফেক্ট আর অ্যানিমেশান ব্যবহার করে অলৌকিক ঘটনাগুলো দর্শকদের সামনে 'জ্যান্তভাবে' তুলে ধরার চেষ্টা করেছে।

মিংকিদের প্রোগ্রামে গ্রাফিক্সের কাজ অত্যন্ত চমৎকার। ওরা প্রোগ্রামে চপলকেতুর একটা রঙিন ম্যাপও দেখিয়েছে। তাতে ভূতুড়ে বা 'হন্টেড' অঞ্চলটা লাল রঙের গণ্ডি টেনে স্পষ্ট বুঝিয়ে দিয়েছে। এবং তৃষ্ণা আর ওর সঙ্গীরা বলেছে যে, খুব দায়ে না পড়লে গাঁয়ের লোকেরা ওই অঞ্চলটার ছায়া মাড়ায় না। দিনেরবেলা যদিও বা দু-চারজন ওই এলাকার ওপর দিয়ে যাতায়াত করে, রাতে কারও মাথায় ওরকম দুর্বুদ্ধি চাপে না।

এ পর্যন্ত ব্যাপারটা মোটামুটি ঠিকই ছিল, কিন্তু গোলমাল পাকিয়েছেন পত্রলোচন সিংহ রায় নামে একজন ভদ্রলোক। তিনি ওই স্পর্শকাতর অঞ্চলেই বসবাস করেন। একা নয়—সপরিবারে। ওই এলাকার শতকরা আশি ভাগ সম্পত্তিই তাঁর। বাকি কুড়িভাগের যারা মালিক তারা কখনও ভুল করেও নিজেদের মালিকানা ফলাতে যাননি। ওই পত্রলোচনই স্ত্রী আর ছেলে নিয়ে কেমন করে যেন টিকে আছেন।

মিংকিদের প্রোগ্রামের বেশিরভাগ অংশ জুড়েই রয়েছে পত্রলোচন সিংহ রায়ের সাক্ষাৎকার—যদিও প্রথমটা তিনি টিভি ক্যামেরার সামনে মুখ খুলতে রাজি হননি। তারপর যখন বুঝেছেন ওঁর এলাকার ভূতুড়ে কাণ্ডকারখানা টিভির কল্যাণে পাঁচকান হবেই তখন নিমরাজি হয়ে ইন্টারভিউ দিয়েছেন।

ভদ্রলোক বলেছেন, তিনি নাকি বারো ভুঁইয়ার একজন—মুকুন্দ রায়—তাঁর বংশধর, এবং চপলকেতুর জমিদার। যদিও গ্রামের কেউই তাঁকে জমিদার বলে মান্য করে না।

পত্রলোচনের বিষয়-সম্পত্তির হাঁকডাক বলতে গেলে চমকে ওঠার মতো। আর ওই ভূতুড়ে এলাকায় তাঁর স্থাবর সম্পত্তিও মোটেই কম নয়।

পত্রলোচনের ওই উপদ্রুত অঞ্চলের মধ্যে কী নেই! বড়-বড় থামওয়ালা চারটে বাড়ি—সবক'টাই দোতলা এবং তিনমহলা। তবে সময়ের চাপে এবং অযত্নে এখন তাদের দশমীদশা। খুব পাতলা ইটের তৈরি লোহার কড়ি-বরগাওয়ালা বাড়ি। তার সর্বত্র বট আর অশ্বত্থগাছের রমরমা। তার ফলে ঘন পাতার ফাঁকে-ফাঁকে পাখি আর বাদুড়ের আস্তানা।

চারটে বাড়ি ছাড়াও ওই বদনামী এলাকায় রয়েছে দুটো মন্দির, চারটে পুকুর, আর চণ্ডীমণ্ডপ সমেত একটা প্রকাণ্ড মাপের নাটমঞ্চ। এককালে নাকি এই নাটমঞ্চে নাচ, গান, অভিনয়ের আসর বসত—আর সেখানে অন্তত দুশো দর্শক বসানোর ব্যবস্থা ছিল।

সবমিলিয়ে পত্রলোচনের ভূতগ্রস্ত এলাকাটাকে প্রিয়নাথ

জোয়ারদারের বেশ ইন্টারেস্টিং মনে হল। তা ছাড়া আরও একটা ব্যাপার তিনি লক্ষ করলেন ঃ মিংকিদের প্রোগ্রামটায় ভৌতিক কাণ্ডকারখানা কিছু দেখা না গেলেও কিছু-কিছু অদ্ভুত শব্দের অস্পষ্ট রেকর্ডিং শোনানো হয়েছে। এই শব্দগুলোর খুব একটা বিস্তারিত ব্যাখ্যা খুঁজে পাওয়া যায়নি। অন্তত তৃষ্ণা এবং ওর দুই সহ-রিপোর্টার তাই জানিয়েছে। আরও জানিয়েছে যে, পত্রলোচন সিংহ রায়ের ধারণা পূর্বপুরুষের কোনও অভিশাপেই ওঁর এই জায়গাটা অভিশপ্ত। তবে তার জন্য এখনও পর্যন্ত কারও তেমন ক্ষয়-ক্ষতি হয়নি। শুধু দু-চারজন মানুষ নাকি ওই এলাকা থেকে রহস্যময়ভাবে লোপাট হয়ে গিয়েছে। পত্রলোচন এরকমটাই বলেছেন।

প্রিয়নাথ প্রোগ্রামটা অনেকক্ষণ ধরে 'জরিপ' করলেন। কোনও-কোনও জায়গা বারবার 'রিওয়াইন্ড' করে পরখ করলেন। ফলে সাতাশ মিনিটের ডিভিডি দেখে শেষ করতে প্রিয়নাথের প্রায় দেড়ঘণ্টা লেগে গেল। তারপর টিভি আর ডিভিডি প্লেয়ার অফ করে সোফায় গা এলিয়ে চুপচাপ বসে রইলেন। টেবিল-ল্যাম্পের আলোয় প্যাডের পাতায় লেখা নোট্‌স-এর দিকে অলস চোখে তাকিয়ে রইলেন।

দু-চারজন মানুষের লোপাট হওয়াটা 'তেমন ক্ষয়-ক্ষতি' নয়? আশ্চর্য! পত্রলোচন এরকমটা বললেন কেন?

নাঃ, ব্যাপারটা খতিয়ে দেখার জন্য চপলকেতু যাওয়াটা খুব জরুরি। আর সেইজন্যই মিংকির সঙ্গে একটু কথা বলা দরকার।

সোজা হয়ে বসলেন প্রিয়নাথ। প্যাড টেবিলে রেখে মোবাইল

ফোনটা খুঁজতে শুরু করলেন। এই তো ছিল! কোথায় যে গেল।

ফোনটা খুঁজে পেলেন সোফার গদির খাঁজে। তারপর মিংকির নম্বর ডায়াল করলেন। মেয়েটা নিশ্চয়ই এখন অফিসে—একগাদা কাজ নিয়ে ছুটোছুটি করছে।

ফোন একবার রিং হতেই মিংকি ফোন কেটে দিল।

প্রিয়নাথ খানিকটা হতাশ হয়ে মিংকির ফোনের জন্য অপেক্ষা করতে লাগলেন।

মিনিট পনেরোর বেশি অপেক্ষা করতে হল না। মোবাইল ফোনটা বেজে উঠল।

'হাই, ভূতনাথদা—।' মিংকি।

'হ্যাঁ—তোমাকেই ফোন করছিলাম। কয়েকটা ইমপর্ট্যান্ট কথা বলার আছে।'

'বলুন...।'

'তুমি বিজি না তো?'

'না, না—বলুন। আপনার হেল্প এখন আমার কাছে সবচেয়ে জরুরি।'

'তুমি তা হলে একটু কাগজ পেন নাও। কয়েকটা জিনিস একটু লিখে নিতে হবে...।'

দশ-বারো সেকেন্ড চুপচাপ। তারপর ঃ 'বোলিয়ে, দাদা। আই অ্যাম রেডি...।'

'চপলকেতুর এপিসোডটা আমি ক্রিটিক্যালি স্টাডি করেছি। ব্যাপারটা থরোলি ইনভেস্টিগেট করতে হলে আমাকে চপলকেতু যেতে হবে। তার সঙ্গে তোমাকে যেতে হবে। আর "যুক্তিবাদ

প্রসার সমিতি''-র সেক্রেটারি রমাশঙ্কর দত্তকেও আমাদের সঙ্গে যেতে হবে...।'

'রমাশঙ্করজি তো সেখানে গিয়ে সবকিছু ছানবিন করার জন্যে এক পায়ে খাড়া হয়েই আছে। কোত্থেকে আমার মোবাইল নাম্বার জোগাড় করে আমাকে লাস্ট চার দিনে দুবার ফোনও করেছে। বলছে কী, যদি আপনারা জেনুইন হন তা হলে আমাকে অথরাইজ করে দিন—আমি অন ইয়োর বিহাফ চপলকেতুর ব্যাপারটা ইনভেস্টিগেট করছি। বের করে দিচ্ছি জায়গাটা সত্যি-সত্যি হন্টেড না নাটকবাজি। তো আমাদের চ্যানেলের ডিরেক্টর সে-পারমিশান দেননি। আমাকে বলেছেন, যে-কোনও লোককে আমি এভাবে অথরাইজেশান দিতে পারি না। তখন আমি ডিরেক্টর স্যারকে আপনার কথা বলেছি। আপনার নাম শোনার সঙ্গে-সঙ্গে স্যার 'ইয়েস'' বলে দিয়েছেন। তার পর আমি আপনাকে কনট্যাক্ট করেছি—তার আগে নয়।'

'মিংকি, আমি তোমাকে এই কথাটাই বলতে চাইছিলাম। লিখে নাও—তোমাদের ডিরেক্টরের কাছ থেকে আমার একটা অফিশিয়াল অথরাইজেশান দরকার।' একটু থামলেন ভূতনাথ। মিংকিকে লিখে নেওয়ার সময় দিলেন। তারপর ঃ 'আমাদের চপলকেতু ভিজিটের ব্যাপারটা জানিয়ে চপলকেতুর নিয়ারেস্ট পুলিশ ফাঁড়িতে একটা চিঠি দিতে হবে। এ ছাড়া একই চিঠি দিতে হবে লোকাল এমএলএ আর ডিএম-কে। এসব কাগজ চালাচালির ব্যাপার ঠিকমতো না করে রাখলে পরে ঝামেলা হতে পারে।'

নোট নেওয়া শেষ করতে মিংকি একটু সময় নিল। তারপর

বলল, 'ভূতনাথদা, আমাদের প্রোগ্রামটা শুট করতে যাওয়ার সময় পারমিশান বগেরা যা কিছু সব আমিই ছুটোছুটি করে জোগাড় করেছিলাম। আমি ডিরেক্টর স্যারকে বলে এসব অ্যারেঞ্জমেন্ট কমপ্লিট করে নিচ্ছি—আপনি এ নিয়ে কোনও টেনশান নেবেন না। তবে আমার একটা সাজেশান আছে। আই হোপ, আপকা পারমিশান মিল জায়েগা।'

'কী সাজেশান? বলো—।'

'আমাদের চ্যানেল থেকে তৃষ্ণা আর বিনোদকুমারও আমাদের সঙ্গে যাবে। তৃষ্ণা—আমাদের রিপোর্টার—ওকে আপনি প্রোগ্রামটায় দেখেছেন। আর বিনোদকুমার আমাদের এক্সপার্ট ক্যামেরাম্যান। চপলকেতুর এপিসোডটা শুট করার সময় বিনোদকুমার ছিল মেইন ক্যামেরাম্যান। হোয়াট ডু য়ু সে, ভূতনাথদা?'

প্রিয়নাথ বললেন, 'ওরা গেলে আমার কোনও আপত্তি নেই। তবে আমার ইনভেস্টিগেশানের কাজে যেন কোনওরকম ডিসটার্ব্যান্স না হয়...।'

'আপ বেফিকর রহিয়ে, ভূতনাথদা—কোই ডিসটার্ব্যান্স নহি হোগা। আমি গ্যারান্টি দিচ্ছি। তা ছাড়া আরও একটা প্ল্যান আমার আছে।'

'কী প্ল্যান?'

'এক্সিলেন্ট প্ল্যান।' ঝরনার শব্দে হাসল মিংকি ঃ 'আমাদের এই ইনভেস্টিগেশানের ব্যাপারটাও বিনোদকুমার শুট করবে। সেটা থেকে এডিট করে আমরা একটা ফরটি ফাইভ মিনিট্স-এর প্রোগ্রাম বানাব। আমাদের ডিরেক্টর স্যার এই প্রোপোজালটা

ওকে করেছেন...।' কথা শেষ করে আবার হাসল মিংকি। জিগ্যেস করল, 'আইডিয়াটা দারুণ না?'

ভূতনাথ হেসে বললেন, 'হ্যাঁ—দারুণ।'

'আমি তা হলে চপলকেতু যাওয়ার প্রোগ্রামটা সবার সঙ্গে কথা বলে বানিয়ে নিচ্ছি। একটা এসি টাটা সুমো নিয়ে আমরা কলকাতা থেকে স্টার্ট দেব। স্টার্ট দেওয়ার কম সে কম দু-দিন আগে আপনাকে কনফার্ম করব, ঠিক আছে?...ও, হ্যাঁ—আর-একটা কথা।'

'কী কথা?'

'কাল কি পরশুর মধ্যে আমি মিস্টার রমাশঙ্কর দত্তকে নিয়ে আপনার বাড়িতে যাব—আপনার সঙ্গে ইনট্রোডিউস করিয়ে দেব। তা হলে আপনি ওঁর সঙ্গে সামনাসামনি সবকিছু স্ট্রেটকাট ডিসকাস করে নিতে পারবেন। তা ছাড়া স্পটে গিয়ে তো রেগুলার ডিসকাশন হবেই...।'

প্রিয়নাথ ছোট্ট করে 'হুঁ—' বললেন বটে কিন্তু ওঁর মনের মধ্যে আশঙ্কার দুলুনি শুরু হয়ে গিয়েছিল। অ্যানিমেশান আর স্পেশাল এফেক্ট এক জিনিস, আর আসল জিনিস তো আসল...।

একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললেন, 'ওকে, মিংকি। তবে কীভাবে তোমার অ্যারেঞ্জমেন্ট এগোচ্ছে মাঝে-মাঝে ফোন-টোন করে জানিয়ো...।'

'অফ কোর্স জানাব...। তবে শুধু ফোন করে নয়—দেখা করেও জানাব...।'

মিংকির সঙ্গে কথা বলা শেষ করে প্রিয়নাথ ভাবতে বসলেন।

হঠাৎ করে কেমন একটা ভ্যাপসা গরম টের পেলেন। হাত দিয়ে কপাল মুছলেন। একটা লম্বা শ্বাস ছেড়ে ভাবলেন, ভূত-শিকারের সরঞ্জামগুলো সব ঠিকঠাক করে গুছিয়ে নিতে হবে। তারপর দেখতে হবে চপলকেতুর চপল ছায়ার পিছনে সত্যি-সত্যি কোনও অলৌকিক ব্যাপার আছে কি নেই...।

চার

যে-ছেলেটি গাড়ি চালাচ্ছিল তার নাম বিজয় রাধে। বেঁটে, কালো, চোখ-মুখ যেন বাটালি দিয়ে খোদাই করা, কোঁকড়া চুল, কপালে চন্দনের টিপ, আর হাতে একটা স্টিলের বালা। এমন দক্ষ হাতে ও টাটা সুমোটা চালাচ্ছিল যেন ও রাজা, আর গাড়িটা প্রজা। রাস্তার অন্যান্য গাড়িকে ভ্রূক্ষেপ না করে ওর গাড়িটা মসৃণ আঁকাবাঁকা পথ ধরে ব্যালে নর্তকীর মতো সাবলীল ছন্দে বলতে গেলে একেবারে উড়ে যাচ্ছিল। শুধু চপলকেতুর কাছাকাছি আসার পর গাড়িটা এবড়োখেবড়ো ছন্দহীন রাস্তার মুখোমুখি হল, তাই গতি কমাল।

মিংকি বসেছে সামনের সিটে, বিজয় রাধের পাশে।

দ্বিতীয় সারিতে তৃষ্ণা, রমাশঙ্কর দত্ত, আর প্রিয়নাথ।

পিছনের কেবিনে ক্যামেরাম্যান বিনোদকুমার, আর ওর চারপাশে নানান ধরনের লাগেজের বোঁচকাবুঁচকি। তার মাঝে বসে ও কানে মোবাইলের ইয়ার প্লাগ গুঁজে গান শুনছে।

বেশি ঠান্ডা লাগছিল বলে মিংকি এ. সি.-টা একটু বন্ধ করতে বলেছিল। সেই সুযোগে জানলার কাচ নামিয়ে তৃষ্ণা আর মিংকির অনুমতি নিয়ে প্রিয়নাথ একটা সিগারেট ধরালেন। সিগারেটে লম্বা টান দিয়ে বললেন, 'মিংকি, একটা কথা তোমাদের কিন্তু আগেই বলে রাখি। ইন জেনারেল, ভূতরা কিন্তু একটু লাজুক নেচারের হয়। সহজে দেখা দিতে চায় না।'

পাশ থেকে রমাশঙ্কর মন্তব্য করলেন, 'আমাকে দেখলে তেনারা আবার একটু বেশি লাজুক হয়ে পড়তে পারেন...।'

প্রিয়নাথ পালটা খোঁচা দিয়ে বললেন, 'হুঁ। দেবতাদের দেখলে অপদেবতারা একটু বেশি ভয়-টয় পাবে এটাই তো ন্যাচারাল....।' কথা শেষ করে আড়চোখে রমাশঙ্করকে দেখলেন।

মানুষটা চোয়াল শক্ত করে সামনের রাস্তার দিকে তাকিয়ে আছে। মুখের চেহারা দেখে মনে হয় যেন ভূতের খোঁজে নয়, কোনও জঙ্গি লড়াইয়ে চলেছে।

রমাশঙ্করের লেখা চিঠিতে এই ভাবটা প্রিয়নাথ প্রথম খেয়াল করেছিলেন।

চপলকেতু রওনা হওয়ার আগে রমাশঙ্করকে নিয়ে প্রিয়নাথের বাড়িতে এসেছিল মিংকি। প্রথম পরিচয়ের পালাটা ও নিয়মমাফিক সেরে দিয়েছিল।

সেদিন আলাপ করে প্রিয়নাথের মানুষটাকে বেশ অভব্য এবং রুক্ষ মনে হয়েছিল।

প্রিয়নাথ ওঁকে জিগ্যেস করেছিলেন, 'আপনি ভূত-প্রেতে বিশ্বাস করেন না?'

কপাল কুঁচকে প্রিয়নাথের দিকে তাকিয়েছিলেন রমাশঙ্কর ঃ 'করলে কি আর "রেনবো" চ্যানেলকে ওই চিঠি লিখতাম?'

'ভগবানে বিশ্বাস করেন?'

রমাশঙ্কর বিরক্ত হওয়ার একটা শব্দ করে বললেন, 'ওঃ! আবার সেই বস্তাপচা প্রশ্ন! শুনুন, মিস্টার জোয়ারদার...ভগবান হচ্ছে একটা কনসেপ্ট। সেটা বিশ্বাস কি অবিশ্বাসের প্রশ্নের আওতার বাইরে। কিন্তু ভূতটা কোনও কনসেপ্ট নয়—স্রেফ একটা কুসংস্কার। এটা ভাঙিয়ে আজকাল অনেকেই করে খাচ্ছে...।'

স্পষ্ট খোঁচা। প্রিয়নাথ এবং মিংকির প্রতি। কারণ, সরাসরি হোক বা ঘুরপথে হোক, প্রিয়নাথ আর মিংকি ভূত ভাঙিয়েই আয় করছে।

রমাশঙ্কর দত্ত শুধু যে রুক্ষ এবং অভব্য স্বভাবের তা-ই নয়, ওঁর কথাবার্তার ঢঙে বেশ সবজান্তা গোছের হামবড়া ভাবটাও মিশে আছে।

সেইজন্যই প্রিয়নাথ আর কথা বাড়াতে চাননি।

কিন্তু রমাশঙ্কর ওঁর ব্যাগ থেকে নানান কাগজপত্র বের করে ওঁর কুসংস্কারবিরোধী অভিযানের বহুমুখী সাফল্যের সাতকাহন শোনাতে শুরু করে দিয়েছিলেন।

একটু পরেই প্রিয়নাথের মাথা ভোঁ-ভোঁ করতে শুরু করল। সম্ভবত মিংকিরও। রমাশঙ্করের কথা ঠিকঠাকভাবে ওদের দুজনের কানে ঢুকছিল না।

শেষদিকে প্রিয়নাথ শুনতে পেলেন ঃ 'এই টিভি চ্যানেলগুলো সবচেয়ে বেশি প্রতিক্রিয়াশীল। এরা ব্যাবসার জন্যে যা খুশি তাই

করতে পারে। তাই আমরা "যুক্তিবাদ প্রসার সমিতি"-র পক্ষ থেকে সবসময় ভাঁওতা আর বুজরুকির তীব্র প্রতিবাদ করি...।' একটু থেমে তারপর বললেন, "'রেনবো"-র প্রোগ্রামে শোনানো ওইসব শব্দ-টব্দ ভূতুড়ে বলে চালানো হলেও ওগুলো কোনও মতেই অথেনটিক নয়। আজকাল ওসব লোকঠকানো শব্দ ল্যাবরেটরিতে জুড়ে দেওয়া কোনও ব্যাপার নয়। তা হলে প্রোগ্রামটায় আর রইল কী!'

পরিস্থিতি হালকা করার জন্য প্রিয়নাথ তখন বলেছিলেন, 'তবে যাই বলুন, আপনার চিঠিটা কিন্তু আননেসেসারিলি অ্যাটাকিং মুডে লেখা। একটা অফিশিয়াল চিঠি...।'

প্রিয়নাথকে থামিয়ে রমাশঙ্কর উত্তর দিয়েছেন, 'মিস্টার জোয়ারদার, একটা কথা বলে রাখি। প্রোটেস্ট করতে হলে প্রোটেস্ট করার ভাষাটা জোরালো হওয়া দরকার—গলার আওয়াজ নয়। তা ছাড়া, আমার চিঠিতে গলার আওয়াজের কোনও ব্যাপার নেই। সেজন্যেই ভাষাটা একটু স্ট্রং দিয়েছি—।'

এ-কথায় মিংকি সামান্য হেসে ফেলেছিল। এতসব রুক্ষতা, অভব্যতা, সবজান্তাভাবের আড়ালে রমাশঙ্করের কথাবার্তায় কোথায় যেন একটা কমিক-কমিক ব্যাপার লুকিয়ে আছে।

পাশে বসা প্রতিবাদী মানুষটাকে লক্ষ করছিলেন প্রিয়নাথ।

বয়েস বেশি নয়—চুয়াল্লিশ কি পঁয়তাল্লিশ। বেশ ফরসা মোটাসোটা চেহারা। গালফোলা। চওড়া নাকের নীচে পুরু গোঁফ। কপালে সবসময় বিরক্তির ভাঁজ পড়ে আছে। চোখে চশমা। চশমার কাচের ভেতর দিয়েও বোঝা যায়, চোখের নজর বেশ চোখা।

'চপলকেতুর চপল ছায়া'-র একটা সিডি রমাশঙ্কর দত্তকেও দিয়েছিল মিংকি। সেটা দেখার পর ভদ্রলোক ঘুরিয়েফিরিয়ে মিংকিকে অনেক প্রশ্ন করেছেন। কিন্তু মিংকি ছোট-ছোট 'হুঁ-হাঁ' উত্তর দিয়ে বেশিরভাগটাই এড়িয়ে গেছে। শুধু একটা কথাই বারবার বলেছে, 'আমাদের প্রোগ্রামটা শুট করার মধ্যে কিন্তু কোনও হ্যাংকিপ্যাংকি নেই, মিস্টার দত্ত। আমাদের টিম কিন্তু খুব অনেস্ট অ্যান্ড জেনুইন...। আপনি ওখানে গেলেই সব বুঝতে পারবেন...।'

তারপরেও, গাড়িতে রওনা হওয়ার পর থেকে, মাঝে-মাঝেই, রমাশঙ্কর প্রশ্ন ছুড়ে দিচ্ছিলেন। কখনও মিংকিকে, কখনও তৃষ্ণাকে, আবার কখনও-বা বিনোদকুমারকে। তখনও ওরা মোটামুটি এটাই জানিয়েছে যে, স্পটে গিয়ে এসব প্রশ্ন-উত্তর পর্ব আলোচনা করা যাবে।

পত্রলোচন সিংহ রায়ের বাড়ির কাছে যখন টাটা সুমো গিয়ে পৌঁছোল, তখন বিকেল প্রায় তিনটে। কারণ, পুলিশ, এমএলএ আর ডিএম-এর অফিসে গিয়ে ফরমালিটি সারতে বেশ কিছুটা সময় গেছে। এ ছাড়া বর্ধমানে গিয়ে একটা ভদ্রগোছের হোটেলে থাকার ব্যবস্থা করতেও এক-দেড় ঘণ্টা সময় লেগে গেছে।

এটা ঠিক হয়েছে যে, মিংকি, তৃষ্ণা আর বিনোদকুমার হোটেলে থাকবে। প্রিয়নাথ সেই শুরু থেকেই জেদ ধরেছেন, তিনি পত্রলোচনদের আস্তানাতেই মাথা গোঁজার ব্যবস্থা করবেন। সুতরাং, রমাশঙ্কর প্রিয়নাথকে একা তদন্ত করার সুযোগ দেওয়ার মতো মূর্খামি করেন কী করে! তিনিও চপলকেতুতেই থাকবেন বলে

জানিয়ে দিয়েছেন।

মিংকির কাছ থেকে চপলকেতুর ম্যাপের একটা প্রিন্ট জোগাড় করেছিলেন প্রিয়নাথ। সেটা বের করে হাতে নিয়ে চলন্ত গাড়ির জানলা দিয়ে বাইরে তাকিয়ে দেখছিলেন। তৃষ্ণা ছুটে যাওয়া জায়গাগুলোর পরিচয় দিচ্ছিল। ও যেহেতু এখানে আগে এসে ঘুরে গেছে, তাই গাইডের রোল প্লে করছিল। আর বিনোদকুমার চুপচাপ বসে ছিল, গুনগুন করে গান করছিল।

চপলকেতু জায়গাটা একেবারে গ্রামস্য গ্রাম। গাছপালা, পুকুর, খড়ের চালে ছাওয়া মাটির বাড়ি—কদাচিৎ খড়ের বদলে টিনের চাল, গোরুর গাড়ি, চাষের খেত—চারপাশে শুধু এসবই চোখে পড়ছিল।

কিন্তু সেই বিশেষ সীমানা পেরিয়ে যেই মাত্র 'ভৌতিক' এলাকায় গাড়িটা ঢুকে পড়ল অমনি চারপাশের ছবিটা কেমন যেন পালটে গেল।

এতক্ষণ যে গ্রামের ছবি দেখা যাচ্ছিল, সেটা পালটে গিয়ে ছন্নছাড়া পতিত জমি, খোলা মাঠ আর জঙ্গলের চেহারা নিল। তারই মধ্যে কোথাও-কোথাও ভাঙাচোরা বাতিল কুঁড়েঘর চোখে পড়ছিল, তাদের ঘিরে অসংখ্য গাছপালা আর আগাছার সংসার।

ডিভিডি-তে এসব দেখেছেন প্রিয়নাথ। কিন্তু বাস্তবের মুখোমুখি হয়ে যেন একটা নতুন ধাক্কা টের পেলেন।

তৃষ্ণা প্রিয়নাথকে টুকটাক ইনপুট দিচ্ছিল। বলছিল, বছর সাত-আট আগেও এই হন্টেড এলাকায় কিছু লোকজন থাকত, চাষবাস করত। কিন্তু দু-চারজন মানুষ নিরুদ্দেশ হয়ে যাওয়ার পর তারাও

ধীরে-ধীরে পাততাড়ি গুটিয়ে চলে গেছে।

জানলা দিয়ে বাইরের দৃশ্য দেখতে-দেখতে প্রিয়নাথের মনে হচ্ছিল, গোটা জায়গাটায় কেমন যেন একটা থমথমে ভাব। গাছপালাগুলো যেন কোনও কিছু হওয়ার আশঙ্কায় চুপটি করে দাঁড়িয়ে অপেক্ষা করছে।

দুটো বিশাল পুকুরের পাশ কাটিয়ে, একটা জীর্ণ মন্দির পেরিয়ে, তারপর ওঁরা যে-চীর্ণ-দীর্ণ বাড়িটায় গিয়ে পৌঁছোলেন, সেটাই পত্রলোচনের বাসা।

ইট-কাঠের দাঁত-মাড়ি বের করা ছিরিছাঁদহীন একটা দোতলা বাড়ি প্রকাণ্ড কচ্ছপের মতো থেবড়ে বসে আছে। বাড়িটার সর্বত্র ছালচামড়া উঠে গেছে। আর যে-কোনও ফাটল কিংবা ফাঁকফোকর থেকে যেমন খুশি বট-অশথের গাছ বেরিয়ে এসেছে।

বাড়ির সামনে প্রকাণ্ড বড় রোয়াক। সেটা ফাটল ধরে একদিকে বেশ খানিকটা বসে গেছে। তারই মাঝামাঝি জায়গায় তিন ধাপ সিঁড়ি। তার দশাও একইরকম। সিঁড়ি বেয়ে উঠলে বাড়িতে ঢোকার দরজা। রোদে-জলে তার পাল্লার রং বলে আর কিছু নেই। চিড় ধরা পাল্লায় আপাদমস্তক শিরার দাগ প্রকট।

রকের লাগোয়া জমিটা এবড়োখেবড়ো। সেই জমিতে কয়েকটা বাঁশ পুঁতে নাইলনের দড়ি টাঙানো। দড়িতে কয়েকটা জামাকাপড়-শাড়ি শুকোতে দেওয়া রয়েছে। তার পাশে একটা পুরোনো দু-চাকার সাইকেল স্ট্যান্ডে তুলে দাঁড় করানো।

প্রিয়নাথের দৃশ্যগুলো চেনা লাগছিল। কারণ, ডিভিডি-তে চপলকেতুর এপিসোডটা তিনি বেশ কয়েকবার দেখেছেন। দেখেছেন

পত্রলোচনকেও।

গাড়ির শব্দ পেয়ে পত্রলোচন বাইরে বেরিয়ে এসেছিলেন। তালঢ্যাঙা রোগা চেহারা। তৃষ্ণা আর বিনোদকুমারকে দেখে কাঠ-কাঠ হাসলেন। হাসিটা দেখে হালকাভাবে বোঝা গেল যে, টিভির পরদার পাবলিসিটি পত্রলোচনের তেমন পছন্দ নয়।

বিজয় সুমোর ভেতরেই বসে ছিল—নামেনি।

প্রিয়নাথদের পাঁচজনকে পত্রলোচন ভদ্রতা দেখিয়ে আপ্যায়নের ভঙ্গিতে বাড়ির ভেতরে আসতে বললেন।

বিনোদকুমার অনেকক্ষণ ধরেই ওর ভিডিয়ো ক্যামেরা চালু করে দিয়েছিল। এখন প্রিয়নাথদের দিকে ক্যামেরা তাক করে পত্রলোচনের বাড়িতে ঢোকার দৃশ্যটা ক্যামেরাবন্দি করতে লাগল।

বাইরের ঘরে সবাইকে বসিয়ে পত্রলোচন চা-বিস্কুটের ব্যবস্থা করতে অন্দরমহলের দিকে রওনা হচ্ছিলেন, কিন্তু রমাশঙ্কর দত্ত ওঁকে বাধা দিলেন। বললেন, 'কিছু মনে করবেন না, মিস্টার সিংহ রায়...এখন চায়ের ব্যাপারটা থাক। আমরা তো এখানে কয়েকদিন থাকব—ফলে চা খাওয়ার অনেক সুযোগ পাওয়া যাবে। এখন বরং একটু জল খাওয়ান—তারপর কাজের কথা হোক...।'

কথাটা শেষ করেই প্রিয়নাথের দিকে তাকালেন রমাশঙ্কর। ভাবটা এমন যেন ওঁর লড়াইটা শুধু প্রিয়নাথের সঙ্গেই।

মিংকি বা তৃষ্ণা কিছু বলল না। আর বিনোদ দুবার কেশে নিয়ে ওর ক্যামেরা চালু করল।

পত্রলোচন জল আনতে চলে গেলেন। একটু পরেই জল ভরতি চারটে প্লাস্টিকের বোতল নিয়ে ফিরে এলেন।

রমাশঙ্কর বোতল নিয়ে জল খেলেন। 'আঃ—' বলে তৃপ্তির শব্দ করলেন।

পত্রলোচন বললেন, 'আমার টিউবওয়েলের জল...।'

বিনোদকুমারও জল খেল। তারপর ক্যামেরা নিয়ে কীসব খুটখাট করতে লাগল।

তৃষ্ণা পত্রলোচনের সঙ্গে প্রিয়নাথ, রমাশঙ্কর, আর মিংকির পরিচয় করিয়ে দিল।

প্রিয়নাথ ঘরটা দেখছিলেন। মাপে বেশ বড়। সিলিংটাও যথেষ্ট উঁচু। তবে দেওয়ালে পলেস্তারা কোথাও আছে, কোথাও নেই। কড়ি-বরগা লোহার হলেও জং ধরে বিপজ্জনক অবস্থায় পৌঁছে গেছে।

ঘরের একদিকের দেওয়ালে ফ্রেমে বাঁধানো গোটা আষ্টেক ব্ল্যাক অ্যান্ড হোয়াইট ফটো। ছবিগুলো বিবর্ণ আর ফ্রেম রং চটা, ঘুণ ধরা। অস্পষ্ট হলেও এটুকু বোঝা যাচ্ছে ওগুলো মানুষের ছবি। হয়তো পত্রলোচনের পূর্বপুরুষদের।

ঘরে কেমন যেন একটা গন্ধ ঘুরপাক খাচ্ছিল। প্রিয়নাথের মনে হল, গন্ধটা ভেজা মাটি আর শ্যাওলার গন্ধ হলেও হতে পারে। ভেজা মাটি হয়তো কাছাকাছি কোথাও থাকতে পারে—কিন্তু শ্যাওলা এখানে কোথা থেকে আসবে? পুকুর তো অনেক দূরে!

মিংকি পত্রলোচনের সঙ্গে কথা বলছিল। কথায়-কথায় রমাশঙ্কর দত্ত আর প্রিয়নাথ জোয়ারদার কেন ওদের সঙ্গে এসেছেন সেটাও জানাল।

তখন পত্রলোচন প্রিনয়াথ আর রমাশঙ্করের দিকে একে-একে

তাকিয়ে গদগদ গলায় বললেন, 'বলুন, স্যার—কী জানতে চান বলুন...।' তিনটে হাতপাখা মেঝেতে পড়ে ছিল। সেগুলো কুড়িয়ে নিয়ে প্রিয়নাথদের দিকে এগিয়ে দিলেন। সঙ্কোচের সঙ্গে বললেন, 'জানেনই তো, এখানে ইলেকট্রিক এখনও আসেনি। তাই পাখা বলতে এগুলো। আপনাদের...বেশ...কষ্ট হবে...।' তারপর পকেট থেকে একটা বিড়ির প্যাকেট বের করে তা থেকে একটা বিড়ি নিয়ে ধরালেন।

প্রিয়নাথ জোয়ারদার ঘামছিলেন। হাত বাড়িয়ে একটা তালপাতার পাখা নিলেন। রমাশঙ্করও একটা নিলেন।

পত্রলোচনের হাতে বিড়ি দেখে প্রিয়নাথের গলা শুকিয়ে উঠল। আর থাকতে পারলেন না। মিংকি আর তৃষ্ণার দিকে তাকিয়ে আবদারের গলায় বললেন, 'উইথ ইয়োর কাইন্ড পারমিশান...।' এবং একটা সিগারেট ধরালেন। ধরানোর পর মনে হল, গরমটা একটু কম লাগছে।

ওঁদের সামনে রাখা একটা জোড়াতালি দেওয়া সেন্টার টেবিলে একটা হাতল ভাঙা কাপ রাখা ছিল। সেটাকেই অ্যাশট্রে হিসেবে পত্রলোচন ব্যবহার করতে লাগলেন। প্রিয়নাথও গৃহকর্তাকে অনুসরণ করলেন।

'এখানে এইসব ভূত-টুতের ব্যাপারগুলো কবে থেকে শুরু হয়?' রমাশঙ্কর বেশ কায়দা করে চিবিয়ে-চিবিয়ে প্রশ্নটা পেশ করলেন। একইসঙ্গে হাতপাখা নেড়ে নিজেকে বাতাস করতে লাগলেন। ওঁর কপালে ঘামের বিন্দু জমছিল।

'সে আর কি অত সাল-তারিখ ধরে মনে আছে! আমি তো

সেই জন্ম থেকেই দেখছি...।'

প্রিয়নাথের মনে পড়ল, মিংকিদের প্রোগ্রামেও ভদ্রলোক এই একই প্রশ্নের একই উত্তর দিয়েছেন।

মিংকি আর তৃষ্ণা একটা হাতপাখা শেয়ার করে গরম ম্যানেজ করছিল, আর একমনে পত্রলোচনের কথা শুনছিল।

'সবচেয়ে মেজর ভুতুড়ে ব্যাপারটা ঠিক কীরকম বলতে পারেন?'

পত্রলোচন সিংহ রায় একটা পুরোনো টুলের ওপরে বসেছিলেন। রমাশঙ্করের প্রশ্নে একটু নড়েচড়ে বসলেন। মুখটা দুবার খুললেন, বন্ধ করলেন। তারপর ঃ 'সন্ধের মুখে বা রাতে কখনও-কখনও খুব পায়ের শব্দ শোনা যায়। হাঁটছে...দৌড়োচ্ছে...অনেক পায়ের শব্দ। কিন্তু কাউকে দেখা যায় না।'

রমাশঙ্কর তৃষ্ণার দিকে তাকালেন, বললেন, 'ম্যাডাম, প্রোগ্রামে তো ওরকম ছুটন্ত পায়ের শব্দ আপনারাও শুনিয়েছেন। সে-শব্দ কি সত্যিই হয়েছিল, নাকি সাউন্ড এফেক্ট জুড়ে দিয়েছিলেন?'

এই বাঁকা প্রশ্নে তৃষ্ণা, মিংকি, বিনোদকুমার—তিনজনেই একেবারে 'হাঁ-হাঁ' করে উঠল।

তাচ্ছিল্য করে এরকম খোঁচা দেওয়া মন্তব্য ভদ্রলোক আগেও করেছেন।

প্রিয়নাথ কোনও জবাব দিলেন না। একমাত্র সময়ই এর সঠিক জবাব দিতে পারবে। তাই তিনি শান্তভাবে বসে সিগারেটে টান দিতে লাগলেন। যদিও রমাশঙ্করের ব্যঙ্গ মেশানো ওস্তাদি ঢংটা ওঁর খুব একটা ভালো লাগছিল না। মনে হচ্ছিল, একটু রেস্ট

নিতে পারলে ভালো হত।

পত্রলোচন রমাশঙ্করের দিকে তাকিয়ে একটু হেসে জিগ্যেস করলেন, 'দত্তসাহেব, আপনারা রাতে এখানে থাকবেন তো?'

'হাঁ—অবশ্যই। ব্যাপারটা তলিয়ে দেখতে হবে না? ভূতুড়ে ব্যাপারগুলো কীভাবে কোন কারসাজিতে হচ্ছে সেটার পরদাফাঁস করতে হবে না?' কথাগুলো বলার সময় রমাশঙ্কর বড় বেশি হাত-পা নাড়ছিলেন।

'খুব ভালো, খুব ভালো—' হাতে হাত কচলে বললেন পত্রলোচন, 'নিজের কানেই তা হলে সব শুনতে পাবেন। আর কম-বেশি দেখতেও পাবেন।' তৃষ্ণা আর বিনোদকুমারের দিকে আঙুল দেখালেন ঃ 'ওঁরা তো হঠাৎ করে একবার মাত্র ওই আওয়াজ শুনতে পেয়েছিলেন...।'

বিনোদকুমার বলল, 'হাঁ—ব্যস একবার। তাও সাউন্ডটা হালকা ছিল।'

তৃষ্ণা তাতে সায় দিল।

প্রিয়নাথের মনে পড়ল, ডিভিডি-তে সেই রেকর্ডিংটা সত্যিই বড় আস্তে শোনা গেছে।

বাইরে বেলা পড়ে আসছিল। জোরে বাতাস দিচ্ছিল। সেই বাতাস খোলা দরজা দিয়ে ঘরের ভেতরে ঢুকে পড়ছিল। তার সঙ্গে কেমন একটা মাটির গন্ধও যেন মিশে ছিল।

সিগারেট শেষ করে হাই তুললেন প্রিয়নাথ জোয়ারদার। তারপর পত্রলোচনকে জিগ্যেস করলেন, 'রাতে আমরা কোথায় থাকব, লোচনবাবু?'

হাসলেন পত্রলোচন ঃ 'ভালো বলেছেন। লোচনবাবু। আমার নামটা একেই পিকিউলিয়ার, তার ওপরে বড্ড লম্বা—' একটা পা ভাঁজ করে গুটিয়ে বসলেন। হাতের বিড়িটা কাপে গুঁজে দিয়ে মাথা পিছনে হেলিয়ে দুবার চাড় দিলেন। তারপর ঃ 'আমার মোট চারটে বাড়ি আছে। এটাতে আমি ফ্যামিলি নিয়ে থাকি। আর বাকি তিনটে বাড়ি একটু তফাতে। তার মধ্যে দুটো বাড়ি চানপুকুরের পাড় ঘেঁষে...।'

মিংকির ডিভিডি-তে চানপুকুরের কথা ছিল। বহুকাল আগে থেকেই ওই পুকুরটা স্নান করার কাজে ব্যবহার করা হত। সেই থেকেই 'চানপুকুর' নামটা ওই পুকুরের গায়ে লেগে গেছে।

'...তা আপনারা দূরে থাকবেন কেন? ইচ্ছে করলে এ-বাড়িতেই থাকতে পারেন। দেখছেনই তো, বাড়িটা হাতির মতো বড়। তিন মহলা বাড়ি। অসংখ্য ঘর। আমি ফ্যামিলি নিয়ে দোতলায় থাকি। একতলায় পেছনদিকে সার দিয়ে চার-চারটে ঘর আছে। এক কালে ছিল গেস্ট হাউস। পেছনদিকেই ঢোকা-বেরোনোর দরজা। আপনারা তার যে-কোনওটায় থাকতে পারেন—আমার কোনও প্রবলেম নেই।'

রমাশঙ্কর বললেন, 'আমার মনে হয় সেটাই ভালো।' প্রিয়নাথের দিকে ঘুরে ঃ 'কী বলেন, মিস্টার জোয়ারদার?'

প্রিয়নাথ মনে-মনে ঠিক এই ব্যবস্থাটাই চাইছিলেন। পত্রলোচন অন্যরকম কিছু বললে তিনি হয়তো এই প্রস্তাবটাই দিতেন।

আবার হাই তুললেন প্রিয়নাথ। কেন যে এত ঘুম-ঘুম পাচ্ছে কে জানে! হাইয়ের রেশ টেনে বললেন, 'এখানে থাকাটাই

ভালো...কাজের সুবিধে হবে।'

'তা হলে চলুন, স্যার। আপনাদের ঘরগুলো দেখিয়ে দিই। বাক্স-প্যাঁটরা নিয়ে আপনারা গুছিয়ে বসুন—।' কথা বলতে-বলতে পত্রলোচন উঠে দাঁড়ালেন।

প্রিয়নাথ মানুষটাকে দেখছিলেন।

প্রথমেই যেটা চোখে পড়ে সেটা লোকটার হাইট। এই ধরনের মানুষকে বোধহয় তালঢ্যাঙা বলা যায়। মনে পড়ছে, মিংকি পত্রলোচনের প্রসঙ্গে একটা অদ্ভুত মন্তব্য করেছিল। বলেছিল, 'লোকটা আননেসেসারি লম্বা।'

শুধু যে লম্বা তা নয়—বেশ রোগাও। গায়ের রং কালো, তেল চকচকে। চোখ দুটো বড়-বড়—তার কোণে স্থায়ীভাবে হাসির সূক্ষ্ম ভাঁজ পড়ে গেছে। চেহারা গ্রাম্য হলেও কোথায় যেন চড়া আত্মবিশ্বাসের তেজ লুকিয়ে রয়েছে। ফলে অতি-বিনয়ী ভাবটা পত্রলোচনের মুখোশ হলেও হতে পারে।

প্রিয়নাথ জলের বোতল তুলে নিয়ে আর-একবার জল খেলেন। মিংকিও ঢকঢক করে খানিকটা জল খেল। তারপর পত্রলোচনকে অনুসরণ করে সবাই বাড়ির বাইরে এসে দাঁড়াল।

পত্রলোচন বললেন, 'গাড়িটা বাড়ির পেছনদিকে ঘুরিয়ে নিয়ে গেলে আপনাদের মালপত্র নামাতে সুবিধে হবে...।'

সুতরাং প্রিয়নাথ আর রমাশঙ্কর টাটা সুমোয় উঠে পড়লেন। ওদের সঙ্গে মিংকিও উঠে পড়ল। আর পত্রলোচন সামনের সিটে বসে পড়লেন।

বিজয় গাড়ি স্টার্ট দিয়ে বাড়ির পিছনদিকে রওনা হল।

বিনোদকুমার গুনগুন করে গান করছিল। গাড়িটা চলে যেতেই ও তৃষ্ণার দিকে তাকিয়ে বলল, 'তৃষ্ণা, আমি সন্ধের পর এখানে থাকব না, আর শুট করতেও পারব না। শুধু দিনের আলোয় যা-যা অ্যাক্টিভিটি হবে সেগুলো টোটালি ক্যামেরায় নিয়ে নেব।'

বিনোদের স্বাস্থ্য ভালো। লম্বা-লম্বা চুল। পুরু গোঁফ। এক কানে দুল। সবমিলিয়ে বেশ রাফ অ্যান্ড টাফ চেহারা। কিন্তু বড্ড ভীতু। সেটা আগেরবারই তৃষ্ণা টের পেয়েছিল। সেবারও ওরা সূর্য ডোবার পর চপলকেতুতে থাকেনি। বর্ধমানে হোটেলে চলে গিয়েছিল। নেহাত সন্ধের মুখে ছুটন্ত পায়ের আওয়াজ শোনা গিয়েছিল, তাই ওটা রেকর্ড করতে পেরেছিল। রাত নেমে গেলে আর সে-সুযোগ হত না।

'বিনোদ, তোমার কাজটাই এবার বেশি। নতুন কোনও ডেটা না পেলে আমার মাইক হাতে আর নতুন কী বলার আছে—।'

'আচ্ছা, এই প্রিয়নাথ—মানে, গাঞ্জা লোকটা গোস্ট বাস্টিং-এ এফিশিয়েন্ট তো?'

'কে জানে!' ঠোঁট ওলটাল তৃষ্ণা ঃ 'মিংকি তো ওঁর ব্যাপারে খুব কনফিডেন্ট। বলছে যে, প্রিয়নাথ জোয়ারদার ভদ্রলোক নাকি ভূতের গন্ধ পায়।' মাথা ঝাঁকিয়ে তৃষ্ণা বলল, 'ওঃ, মিস্টার জোয়ারদার ভূতের স্মেল পেলে আমাদের চ্যানেলটা উটকো ঝামেলা থেকে বেঁচে যায়...।'

'আমরা তো আগেরবার শুধু দিনেরবেলাতেই শুট করেছিলাম। তাতে শুধু ওই রানিং ফিটের সাউন্ড রেকর্ড করতে পেরেছিলাম।

মে বি, রাতে শুট করতে পারলে আরও থ্রিলিং কিছু মেটিরিয়াল পেতাম। শুধু সাউন্ড নয়—ভিশুয়ালসও পেতাম।'

তৃষ্ণা হাসল। ঠাট্টা করে বলল, 'তোমার নার্ভের যা অবস্থা তাতে রাতের থ্রিলিং ভিশুয়াল্‌স পাওয়ার আশা ছাড়ো। কিন্তু ওই দুজনের সাহস আছে বলতে হবে। রাতে এখানেই থাকবে বলছে! দিনেরবেলার চেহারা দেখেই আমার কেমন-কেমন লাগছে তো রাতেরবেলা!'

'তোমার নার্ভও দেখছি আমার চেয়ে কিছু বেটার নয়...।' বিনোদকুমার হাসল। তারপর মোবাইলের ইয়ার প্লাগ কানে গুঁজে দিয়ে গান শুনতে লাগল।

সূর্য হেলে পড়েছে। পশ্চিম দিকটা কমলা রঙে ছেয়ে গেছে। চারপাশে কোনও শব্দ নেই। একজন মানুষও চোখে পড়ছে না। শুধু ছোট-বড় গাছ চুপচাপ দাঁড়িয়ে। তৃষ্ণার মনে হল গাছগুলো ওদের ওপরে নজর রাখছে।

টাটা সুমোটা ফিরে এল।

প্রিয়নাথ, রমাশঙ্কর আর পত্রলোচন গাড়ি থেকে নেমে এলেন। মিংকিও নামল।

তৃষ্ণা আর বিনোদ গাড়িতে উঠতে যাচ্ছিল। আর দেরি করা ঠিক হবে না। একটু পরেই সূর্য ডুবে যাবে। তারপর কী-কী হবে কে জানে!

হঠাৎই তৃষ্ণা খেয়াল করল প্রিয়নাথ মিংকিকে বলছেন, 'না, মিংকি, এটা হয় না। খুব রিস্কি হয়ে যাবে। একটা রাত আমরা দেখে নিই—তারপর যদি সেফ মনে করি তখন দেখা যাবে...।'

'না, ভূতনাথদা—' মাথা ঝাঁকাল মিংকি ঃ 'আপনারা সেফ থাকলে আমিও সেফ থাকব। আমি অ্যাডভেঞ্চারের এতবড় স্কোপটা মিস করতে চাই না। প্লিজ, আপনারা আমাকে তাড়িয়ে দেবেন না। আচ্ছা, আমি প্রমিস করছি, যদি আজ রাতে সেরকম কিছু হয় তা হলে কাল থেকে আমি তৃষ্ণাদের সঙ্গে হোটেলেই থাকব। ওকে?'

তৃষ্ণা প্রায় চেঁচিয়ে বলল, 'মিংকি, আর য়ু ক্রেজি?'

হাসল মিংকি। বলল, 'ডোন্ট উয়ারি, তৃষ্ণা। আমি শুধু ফার্স্টহ্যান্ড দেখতে চাই যে, আমাদের চ্যানেল জেনুইন আর অনেস্ট। সো, আমি এখানে থাকছি—ব্যস।'

রমাশঙ্কর হেসে বললেন, 'আপনার কোনও ভয় নেই, মিস তেওয়ারি—এখানে সুপারন্যাচারাল বলে কিছু নেই। কারণ, সুপারন্যাচারাল বলে কিছু হয় না। ওগুলো মানুষের কল্পনা...।'

রমাশঙ্করের কথা শেষ হওয়ার আগেই শব্দটা শোনা গেল।

অনেকগুলো পা একসঙ্গে দৌড়োচ্ছে। পত্রলোচনের বাড়িটাকে ঘিরে দৌড়োচ্ছে। কখনও বাড়ির ভেতরদিকে চলে যাচ্ছে, কখনও বাড়ির দিক থেকে বেরিয়ে ছুটে যাচ্ছে দূরের গাছপালা আর আগাছা ভরা পতিত জমির দিকে।

বিনোদকুমার আর তৃষ্ণা চট করে গাড়িতে উঠে পড়ল। দড়াম করে দরজা বন্ধ করল।

বিনোদের কানে ইয়ারপ্লাগ গোঁজা ছিল। তাই শব্দ-টব্দ যে ও খুব একটা শুনতে পেয়েছিল তা নয়। কিন্তু এই অলৌকিক ছোটাছুটির সঙ্গে তাল মিলিয়ে মাটিতে কাঁপন জাগছিল। সেটা

বিনোদ স্পষ্ট টের পেয়েছিল।

বিজয় রাধে মিংকির দিকে উন্মুখ হয়ে তাকিয়ে গাড়ি ছেড়ে দেওয়ার অনুমতির জন্য অপেক্ষা করছিল।

মিংকি ওকে ইশারায় চলে যেতে বলল। বিজয় এমনভাবে গাড়িটা ছোটাল যেন ও ফরমুলা ওয়ান-এ নাম দিয়েছে।

প্রায় সঙ্গে-সঙ্গে মিংকি বিজয়কে ওর মোবাইলে ফোন করল।

বিজয় ফোন ধরতেই বলল, কাল সকাল সাড়ে ন'টায় ও যেন বিনোদকুমার আর তৃষ্ণাকে নিয়ে পত্রলোচনবাবুর এখানে চলে আসে।

বাতাসের ঝাপটা শুরু হয়ে গেল হঠাৎ। বিনা মেঘে যেন ঝড় উঠল। গাছপালার পাতায়-পাতায় খসখস শব্দ শুরু হল। আশ্চর্যভাবে গাছের সবুজ পাতাও খসে পড়তে লাগল মাটিতে। তারপর মাটিতে পড়ে থাকা শুকনো পাতা আর খড়কুটোর সঙ্গে সবুজ পাতাগুলোও ঘূর্ণি বাতাসে ঘুরপাক খেতে লাগল। প্রিয়নাথদের চোখে-মুখে এসে আছড়ে পড়তে লাগল।

মিংকি মোবাইল ফোন বের করে দৃশ্যটার ছবি তুলতে লাগল।

প্রিয়নাথ ঘটনাটা শুধু দেখছিলেন এবং শুনছিলেন না—অনুভব করতেও চাইছিলেন। মিংকির ডিভিডি-তে ঝড় ওঠেনি, মাটি কাঁপার কথাও বলা হয়নি।

সন্ধে হয়ে আসছে। আকাশে মলিন কমলা আর লাল রং। তারই মাঝে-মাঝে গাঢ় ছাই রঙের মেঘের তুলির রেখা। বাসায় ফেরা কোনও পাখির দেখা নেই আকাশে।

প্রিয়নাথের পায়ের নীচে জমি কাঁপছিল। আর অসংখ্য অদৃশ্য

পায়ের ছোটাছুটি তখনও চলছিল।

মিংকি চোখ বড়-বড় করে জিগ্যেস করল, 'প্রিয়নাথদা, কী ব্যাপার?'

প্রিয়নাথ ঠোঁটে আঙুল রেখে ইশারায় ওকে চুপ করে থাকতে বললেন।

কিন্তু রমাশঙ্কর দত্ত হেসে উঠলেন। হাসিটা কাঠ-কাঠ এবং বোকার মতো শোনাল। তারপর যে-কথাটা বললেন সেটা বোকা-বোকা শোনাবে জেনেও বলে ফেললেন, 'ভূমিকম্প হচ্ছে—ভূমিকম্প। হালকা। সাইজমোগ্রাফ থাকলে বোঝা যেত...।'

মিংকি অবাক হয়ে বলল, 'ভূমিকম্প! শুধু এই জায়গাটায়?'

'হয়তো অন্য জায়গাতেও হচ্ছে—আমরা সেটা জানব কী করে! জানেন, বছরে মোট দশ লাখেরও বেশি আর্থকোয়েক হয়!'

পত্রলোচন চুপচাপ দাঁড়িয়ে ছিলেন। এবার প্রায় ফিশফিশ করে বললেন, 'এখানে তো আকছারই এরকম ভূমিকম্প হচ্ছে।' কিছুক্ষণ চুপ করে থাকার পর ঃ 'চলুন, স্যার, ভেতরে চলুন। আঁধার হয়ে আসছে—বাইরে থাকার আর দরকার নেই।'

পত্রলোচনের সঙ্গে ওরা তিনজন বাড়ির ভেতরে ঢুকে এলেন। তখনও ছোটাছুটির শব্দটা আবছাভাবে শোনা যাচ্ছিল।

মিংকি পত্রলোচনকে জিগ্যেস করল, 'এসব যে উলটোপালটা ব্যাপার হয় তাতে এখানে থাকতে আপনার ভয় করে না?'

মলিন হাসলেন পত্রলোচন ঃ 'ওসব গা সওয়া হয়ে গেছে, দিদিভাই—।'

ঘরে টেবিলের ওপরে দুটো হ্যারিকেন জ্বলছিল। নিশ্চয়ই ওঁর

স্ত্রী কিংবা ছেলে এক ফাঁকে এসে জ্বেলে দিয়ে গেছে।

এখনও পর্যন্ত ওদের দেখা পাননি এ-কথা ভেবে প্রিয়নাথের একটু অবাক লাগছিল।

পাঁচ

বাড়ির পিছনদিকে তিনটে ঘরে প্রিয়নাথরা আস্তানা গেড়েছেন। পাশাপাশি দুটো ঘরে মিংকি আর প্রিয়নাথ। তারপর একটা ঘর বাদ দিয়ে রমাশঙ্কর।

আজ রাতের খাওয়াদাওয়ার ব্যবস্থা পত্রলোচন নিজের ভাঁড়ার থেকেই করেছেন। মিংকি চ্যানেলের তরফ থেকে খরচ বাবদ ওঁকে দু-হাজার টাকা দিয়েছে। পত্রলোচন কিছুতেই টাকা নিতে চাননি। বলেছেন, ওঁর শরীরে বারো ভুঁইয়ার রক্ত। কী করে তিনি টাকা নেবেন!

অনেক জেদাজেদি করে তারপর মিংকি ওঁকে টাকা দিতে পেরেছে।

তিনজনের ঘরেই দুটো করে হ্যারিকেন আর মোমবাতি দিয়ে গেছেন পত্রলোচন। তার সঙ্গে একটা করে হাতপাখা। ইলেকট্রিসিটি নেই বলে বারবার দুঃখ প্রকাশ করেছেন। তাতে প্রিয়নাথরা বলেছেন যে, চপলকেতুর এপিসোডটা দেখে ওঁরা আগে থেকেই এ-খবরটা জানতেন। সুতরাং ওঁর অস্বস্তির কোনও কারণ নেই।

প্রিয়নাথ ওঁর ঘরে মেঝেতে বসে ছিলেন। গায়ে গাঢ় বাদামি

রঙের হাতকাটা পাঞ্জাবি আর সাদা পাজামা। সামনে একটা সুটকেস। তার ডালা খোলা। হ্যারিকেনের আলোয় সুটকেসের ভেতরের জিনিসগুলো দেখা যাচ্ছিল। ভূতশিকারির 'অস্ত্রশস্ত্র'।

ঘরের দেওয়ালে একটা ছায়া দেখতে পেয়ে চমকে মুখ ফেরালেন ভূতনাথ।

মিংকি এসে ঘরে ঢুকেছে। ওর পরনে জিন্‌স আর টি-শার্ট। হাতে একটা টর্চ। হ্যারিকেনের আলোয় দেওয়ালে ওর বেঢপ ছায়া পড়ছে।

'কী? একা-একা ভয় করছে নাকি?' প্রিয়নাথ মজার সুরে জিগ্যেস করলেন।

'জানেন, আমার মোবাইলে কোনও টাওয়ার পাচ্ছি না! অথচ বিকেলবেলায় ছিল! বাড়িতে একটা ফোন লাগাতে গিয়ে দেখি টাওয়ার গন...!'

'আমারও একই অবস্থা।...আরও দু-একদিন না দেখে ঠিক বোঝা যাবে না এর রিজ্‌নটা সাইবারস্পেসের সমস্যা, না চপলকেতুর সমস্যা...।'

মিংকি কিছুক্ষণ চুপ করে তাকিয়ে রইল ভূতনাথের দিকে। ওর মুখে দিশেহারা ভাব।

তারপর সটান এসে বসে পড়ল প্রিয়নাথের পাশে। বলল, 'সত্যি, আপনি আছেন বলে ভয় করছে না—নইলে করত। এসব কী?' খোলা সুটকেসের দিকে আঙুল দেখিয়ে জিগ্যেস করল।

'এগুলো ভূত খোঁজার কাজে লাগে...।'

মিংকি সুটকেসের সরঞ্জামগুলো দেখছিল। প্যাড, পেনসিল,

একটা ছোট টেপরেকর্ডার, চার ব্যাটারির তেজি টর্চ, আর একটা ছোট টর্চ, ভিডিয়ো ক্যামেরা, ডিজিটাল ক্যামেরা, নানান মাপের অনেকগুলো ব্যাটারি, পোস্ট-ইট নোটের ছোট প্যাড, দরজিরা যে ব্যবহার করে সেরকম রঙিন মার্কার, নরম মোম, টেপ-মেজার, সুতোর গুলি, কাঁচি, হাফডজন মোমবাতি, থার্মোমিটার আর ম্যাগনেটিক কম্পাস।

এগুলোর ব্যবহার সম্পর্কে মিংকি কিছু-কিছু খবর জানে। কারণ, ওদের চ্যানেলে ইন্টারভিউ দেওয়ার সময় ভূতনাথ ভূতশিকারির কাজকর্ম সম্পর্কে বেশ কিছু কথা ব্যাখ্যা করে বলেছিলেন।

যেমন, ভূতদের চরিত্র সম্পর্কে বলেছিলেন, '...ভূত-প্রেতরা হচ্ছে অনেকটা আমাদের পুলিশের মতো। দরকারের সময় দেখা দেয় না। মানে, যখন তুমি সাংঘাতিকভাবে কোমর বেঁধে ভূতের খোঁজ করছ, তখন তার দেখা পাবে না। আর যখন তুমি ভূতের দেখা পাওয়া যাবে বলে ভাবছই না, তখন তারা হঠাৎ করে হাজির হয়ে তোমাকে একেবারে চমকে দেবে। তাই সবসময় তৈরি থাকতে হয়...।'

'ভূতনাথদা, ছোটাছুটির আওয়াজগুলো কীসের? কিছু আইডিয়া করতে পারলেন?' মিংকি চাপা গলায় জানতে চাইল।

'না, এখনও বুঝতে পারিনি। ব্যাপারটা কি জেনুইন, নাকি পত্রলোচনের লোকঠকানো ম্যাজিক—সেটা নিয়েও ভাবছি। তা ছাড়া আমাদের ডেকে নিয়ে এসে এরকম ভূতুড়ে ম্যাজিক দেখিয়ে ওঁর কী লাভ?'

কিছুক্ষণ চুপ করে ভাবলেন ভূতনাথ। তারপর মিংকিকে জিগ্যেস করলেন, 'আচ্ছা, তোমরা কী করে এই ভূতুড়ে স্পটটার খোঁজ পেলে বলো তো? পত্রলোচন সিংহ রায় কি নিজে তোমাদের চ্যানেলের সঙ্গে কনট্যাক্ট করেছিলেন?'

'না, না—' মাথা নাড়ল মিংকি ঃ 'উনি কোনও কনট্যাক্ট করেননি। আমরাই এই হন্টেড স্পটটার খোঁজ পেয়েছিলাম। আমাদের চ্যানেলের স্ক্রিপ্ট সুপারভাইজার অলোকদা—অলোক সান্যাল—উনিই আমাকে জায়গাটার খোঁজ দিয়েছিলেন। ওঁর কোন এক রিলেটিভ নাকি শিবাইচণ্ডীর কাছাকাছি কোথায় থাকেন। তাঁর কাছ থেকে অলকদা এখানকার হন্টিং-এর খবরটা পান...।'

ঠোঁট কামড়ালেন প্রিয়নাথ ঃ 'তা হলে তো পত্রলোচনকে সন্দেহ করা যাবে না। তা ছাড়া এসব ম্যাজিক-ফ্যাজিক দেখিয়ে ওঁরই বা কী বেনিফিট? তোমরা কি ওঁকে কোনও টাকাপয়সা দিয়েছ নাকি?'

'এক পয়সাও দিইনি।' জোর গলায় বলল মিংকি, 'শুরু-শুরু সে ভদ্রলোক শুট করার ব্যাপারে বেশ ভালোরকম আপত্তি করেছিলেন। অনেক তোয়াজ করে ওঁকে রাজি করানো হয়েছে। আফটার দ্যাট তৃষ্ণা আর বিনোদের সঙ্গে ওঁর খুব হার্টি রিলেশান হয়ে যায়। ওভারঅল মানুষটা খারাপ না। শুট করার পর বিনোদরা টাকা অফার করেছিল কিন্তু উনি নেননি। দেখলেন না, আমি যে দু-হাজার টাকা এক্সপেন্সের জন্যে দিচ্ছিলাম সেটাও প্রথমে নিচ্ছিলেন না—।'

'হুঁ—।' আনমনাভাবে বললেন প্রিয়নাথ।

টর্চ আর ডিজিটাল ক্যামেরা হাতে নিলেন। তারপর উঠে দাঁড়ালেন।

'চলো, একটু বাইরে যাই—।'

প্রিয়নাথ আর মিংকি বাইরের দিকে পা বাড়াল।

মিংকি বলল, 'মিস্টার দত্ত একবার আমার রুমে এসেছিলেন। ওই দৌড়োদৌড়ির সাউন্ডটাকে আর্থকোয়েকের ট্রেমরের সাউন্ড বলে আর-একবার বুঝিয়ে গেলেন। ভদ্রলোক বলে কী, সবকিছুরই একটা সায়েন্টিফিক এক্সপ্ল্যানেশান আছে। যখন আমরা সেই এক্সপ্ল্যানেশানটা খুঁজে পাই না, তখন সেই ঘটনার গায়ে "ভৌতিক" লেবেল সাঁটিয়ে দিই...।'

প্রিয়নাথ ছোট্ট করে হাসলেন। পকেট থেকে সিগারেট আর লাইটার বের করে ধরালেন।

কথা বলতে-বলতে ওরা বাইরে এসে দাঁড়াল।

ওদের চোখের সামনে ঘোলাটে অন্ধকার। পিছনে বাড়িটা একটুকরো পাহাড়ের মতো দাঁড়িয়ে।

সিগারেটের আগুনের আভায় প্রিয়নাথের আবছা প্রোফাইল দেখা যাচ্ছিল।

মিংকি জিগ্যেস করল, 'মিস্টার সিন্‌হা রয়ের ওয়াইফ আর সানের ব্যাপারটা কিন্তু বেশ মিস্টিরিয়াস। আমরা সেই বিকেল তিনটেয় এসেছি, কিন্তু এখনও পর্যন্ত ওদের একবারও দেখলাম না...।'

'হয়তো ওরা অসুস্থ...বেডরিড্‌ন...কে জানে!' সিগারেটে টান দিয়ে ধোঁয়া ছাড়লেন প্রিয়নাথ।

'না, ভূতনাথদা—শুধু এবারে নয়, লাস্ট টাইম বিনোদ, তৃষ্ণা, আরও সবাই...ওরা যখন তিনদিন ধরে কাজ করেছিল তখনও পত্রলোচনের ওয়াইফ আর সানকে দেখতে পায়নি!'

'ঠিক আছে—কাল সকালে ওঁকে জিগ্যেস করে দেখব...।'

সময়টা বর্ষা থেকে শরতের দিকে ঢুকে পড়ছে। তাই গরম সেরকম নেই। আর হাওয়া বইছে এলোমেলোভাবে। ভেজা মাটির গন্ধ আর কিছুটা গাছ-পাতা কিংবা শ্যাওলার গন্ধ প্রিয়নাথের নাকে আসছিল।

সিগারেটে আমেজের টান দিতে-দিতে কী মনে হওয়ায় পকেট থেকে টর্চটা বের করে নিলেন। সামনের গাছপালা আর মাঠের দিকে তাক করে টর্চ জ্বাললেন। যতটুকু দেখা গেল সবটাই নিরীহ দৃশ্য ঃ গাছের গুঁড়ি, ফাঁকা মাঠ, আর অন্ধকার।

মাটির দিকে টর্চের আলো ফেললেন প্রিয়নাথ। সাধারণ ঘাস-মাটির জমি। সেখানে কোনও ফাটল চোখে পড়ল না।

কয়েকটা পাখি-টাখি উড়ে যাওয়ার ডানা ঝাপটানোর শব্দ পেলেন। কিন্তু ওপরে চোখ তুলে কোনও উড়ন্ত ছায়া দেখতে পেলেন না। শুধু আকাশের মলিন চাঁদের সঙ্গে চোখাচোখি হল।

এইরকম অজ গাঁয়ে রাতে ঝিঁঝিঁর ডাক শুনতে পাওয়াটা বলতে গেলে স্বাভাবিক ঘটনা। কিন্তু প্রিয়নাথ খেয়াল করলেন, ঝিঁঝিঁর ডাক এক কণাও শোনা যাচ্ছে না।

চারপাশটা এত নিস্তব্ধ, এত ফাঁকা যে, প্রিয়নাথের কেমন একা-একা লাগছিল।

হঠাৎই পিছনে পায়ের শব্দ পেয়ে তাকালেন।

রমাশঙ্কর দত্ত। টর্চ জ্বেলে প্রিয়নাথদের দিকেই আসছেন।

'কী, মিস্টার জোয়ারদার, আর কিছু পেলেন?'

প্রিয়নাথ মাথা নাড়লেন, তারপর বললেন, 'না—।'

'ওই যে সন্ধের মুখে শব্দটা আমরা শুনলাম, সেটা আর্থকোয়েকের ট্রেমর। ন্যাচারাল ফেনোমেনন—সুপারন্যাচারাল কিছু নয়। একটু আগে মিস তেওয়ারিকে আমি বলছিলাম...।'

কথা বলতে-বলতে প্রিয়নাথদের কাছে এসে দাঁড়ালেন।

ঠিক তখনই দূরে কী একটা যেন প্রিয়নাথের নজরে পড়ল। তিনি গভীর মনোযোগে সেদিকে তাকিয়ে রইলেন। রমাশঙ্করের কথার কোনও জবাব দিলেন না।

প্রিয়নাথকে চুপ করে থাকতে দেখে মিংকি ওঁর দিকে তাকাল। তারপর ওঁর নজর অনুসরণ করে দূরে।

বহুদূরে একটা সাদা মেঘের পিণ্ড চোখে পড়ছে। মাটির খুব কাছাকাছি। মাটি থেকে বড়জোর পাঁচ-ছ'হাত ওপরে। খুব ধীরে-ধীরে ভেসে আসছে প্রিয়নাথদের দিকে। আর যত কাছে আসছে তত মাপে বাড়ছে, ছড়িয়ে পড়ছে।

'ভূতনাথদা, ওটা কী?'

'ঠিক বুঝতে পারছি না। মেঘ বা কুয়াশার মতো মনে হচ্ছে...।'

'এরকম সময়ে ফগ তো ইমপসিব্‌ল! আর মেঘ এত নীচে নেমে আসবে কেমন করে?' মিংকি অবাক হয়ে বলল।

রমাশঙ্কর গলাখাঁকারি দিয়ে বললেন, 'ওটা মেঘ নয়, কুয়াশাও নয়। ওটা হল ধোঁয়া। লোকাল লোকজন উনুন ধরিয়েছে...।'

প্রিয়নাথ রমাশঙ্করের দিকে ঘুরে তাকালেন। সত্যি, চটজলদি

ব্যাখ্যার জোগান দিতে রমাশঙ্করের জবাব নেই। সিগারেটে শেষ টান দিয়ে টুকরোটা ছুড়ে ফেলে দিলেন। তারপর ঃ 'এখানে লোকাল লোক কোথায়?'

'হয়তো আছে—আমাদের চোখে পড়েনি...।'

কুয়াশার পিণ্ডটা ক্রমশ এগিয়ে আসছিল, আর মাপে বাড়তে-বাড়তে অনেকটা এলাকা ছেয়ে গেল।

হঠাৎই বাতাসের উষ্ণতা কমতে লাগল। ওরা তিনজনই সেটা টের পেল।

প্রিয়নাথ বললেন, 'আমি একটু আসছি—।' বলে তাড়াতাড়ি ঘরের দিকে হাঁটা দিলেন।

মিংকি একটু ভয়ের গলায় রমাশঙ্করকে জিগ্যেস করল, 'এখনও কি বলবেন, লোকাল পাবলিক চুলা ধরিয়েছে?'

রমাশঙ্কর বুঝতে পারছিলেন যে, ওঁর যুক্তি তেমন একটা টেকসই জমি পাচ্ছে না। কিন্তু তা সত্ত্বেও নিজের জেদ আঁকড়ে রইলেন।

'হ্যাঁ, তাই বলব—অন্তত যতক্ষণ না আপনাদের কথার কংক্রিট প্রুফ পাচ্ছি। কাল দিনেরবেলা ওখানে গিয়ে জায়গাটা ইনস্পেক্ট করলেই সব বোঝা যাবে...।'

প্রিয়নাথ ফিরে এসেছিলেন। বাঁ-হাতে টর্চ জ্বেলে ডানহাতের একটা জিনিসের ওপরে ধরলেন।

মিংকিরা জিনিসটা দেখতে পেল ঃ একটা লম্বা থার্মোমিটার—খুব চেনা ডাক্তারি থার্মোমিটারের মতো নয়।

মনোযোগ দিয়ে থার্মোমিটারের রিডিং দেখছিলেন প্রিয়নাথ।

লক্ষ করলেন, ধীরে-ধীরে উষ্ণতা কমছে।

চোখ তুলে কুয়াশার পিণ্ডটার দিকে তাকালেন। ওটা আরও কাছে এগিয়ে এসেছে, মাপে আরও বড় হয়েছে।

রমাশঙ্কর ঝুঁকে পড়ে থার্মোমিটারের ওপরে নজর রেখেছিলেন। বিরক্তির একটা ছোট্ট শব্দ করে বললেন, 'আবহাওয়ার খামখেয়ালিপনার কোনও জবাব নেই। যখন-তখন ইর‍্যাটিক্যালি বিহেভ করে। যেখানে আবহাওয়া দপ্তরই এসব ব্যাপার ঠিকঠাক এক্সপ্লেইন করতে পারে না, সেখানে আমরা কীভাবে এক্সপ্লেইন করব!'

এ-কথার কেউ কোনও জবাব দিল না।

প্রিয়নাথ থার্মোমিটার এক পকেটে রেখে অন্য পকেট থেকে একটা চৌম্বক কম্পাস বের করলেন। কম্পাসের ডায়ালে টর্চের আলো ফেললেন।

কম্পাসের কাঁটা এখন উত্তরদিকে মুখ করে নেই। খানিকটা পুবদিকে সরে গিয়ে এলোমেলোভাবে কাঁপছে, পাগলা ঘোড়ার মতো ছটফট করছে।

মিংকির হঠাৎই ভয়-ভয় করতে লাগল। আর্থের ম্যাগনেটিক ফিল্ডের এরকম অস্থির দশা কেন? আর টেম্পারেচার কমে যাওয়ারই বা মানে কী?

রমাশঙ্কর দত্ত প্রিয়নাথের কম্পাস ধরা হাতের ওপরে ঝুঁকে পড়েছিলেন। ভদ্রলোক অদ্ভুত ধরনের ছিনে জোঁকের মতো প্রিয়নাথের সঙ্গে সেঁটে রয়েছেন। যখনই প্রিয়নাথ আপাতভাবে অলৌকিক কোনও ব্যাপারস্যাপারের মুখোমুখি হচ্ছেন তক্ষুনি

রমাশঙ্কর তার একটা বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যার জোগান দিতে ব্যস্ত হয়ে পড়ছেন।

কম্পাসের কাঁটার গতিপ্রকৃতি কিছুক্ষণ ধরে লক্ষ করার পর রমাশঙ্কর বললেন, 'পৃথিবীর চৌম্বক ধর্মের ব্যাপারটা বেশ রহস্যময়। পৃথিবী যে কেন একটা চুম্বক তার সঠিক কারণ বিজ্ঞানীরা এখনও জানে না—শুধু হাতড়ে বেড়াচ্ছে। একটা ডাইপোল থিয়োরি আছে বটে, তবে সেটা অনেকটা কানা মামার মতো। আসলে আর্থের ম্যাগনেটিক ফিল্ড হল একটা দুরন্ত বাচ্চা—কখন কীভাবে বিহেভ করবে তার কোনও ঠিকঠিকানা নেই। সেইজন্যেই কম্পাসের কাঁটাটা এরকম পাগলামো করছে, বুঝলেন?'

প্রিয়নাথ বেশ অবাক হয়ে রমাশঙ্করের মুখের দিকে তাকালেন। কিছু বললেন না। বোধহয় বলার মতো কিছু খুঁজে পেলেন না।

কুয়াশার পিণ্ডটা আরও এগিয়ে আসছিল। তার সঙ্গে টেম্পারেচার কমে যাওয়ার ব্যাপারটা এবার বেশ স্পষ্টভাবে অনুভব করা যাচ্ছিল।

প্রিয়নাথ লক্ষ করলেন, মিংকি কেমন ভয়ে সিঁটিয়ে গেছে। তাই কম্পাস পকেটে রেখে রমাশঙ্করকে বললেন, 'চলুন, আমরা লোচনবাবুর ঘরে যাই। সেখানে গিয়ে একসঙ্গে বসে একটু গল্পগুজব করি...। তা হলে মনটা হালকা হবে। এখানে চারপাশে এত অন্ধকার...!'

প্রস্তাবটা রমাশঙ্কর এবং মিংকি দুজনেই একেবারে লুফে নিল।

সুতরাং, ওঁরা তিনজনে বেশ চটপটে পায়ে বাড়ির সামনের

দিকে এগোতে শুরু করলেন। সবার আগে রমাশঙ্কর—ওঁর হাতে টর্চ জ্বলছে। তার ঠিক পিছনেই প্রিয়নাথ আর মিংকি। মিংকির হাতে একটা ছোট টর্চ ছিল, কিন্তু প্রিয়নাথ টর্চ জ্বেলেছেন বলে ও সেটা আর জ্বালেনি।

রমাশঙ্কর যে হাঁটতে-হাঁটতে দুবার ভেসে আসা কুয়াশার দিকে ঘাড় ঘুরিয়ে তাকিয়েছেন সেটা প্রিয়নাথের নজর এড়ায়নি। মিংকিদের প্রোগ্রামে এই কুয়াশার ছবি না দেখানো হলেও পত্রলোচন ওঁর ইন্টারভিউতে এটার কথা সংক্ষেপে বলেছেন।

প্রিয়নাথ ভাবছিলেন, পত্রলোচন ওঁর ইন্টারভিউতে এমনভাবে কথাবার্তা বলেছেন যে, সেসব কথা শোনার পর কোনও দর্শক চপলকেতুতে আসতে ভয় পাবে।

ব্যাপারটা প্রিয়নাথের একটু অদ্ভুত লেগেছিল। পত্রলোচনের জায়গায় যদি তিনি থাকতেন, তা হলে তিনি চাইতেন টিভিতে সবকিছু দেখার পর চপলকেতু গ্রামে মানুষজন আসুক, জায়গাটা জমজমাট হোক, তার ভূতুড়ে অভিশাপটা কেটে যাক। কারণ, তা হলে এই অভিশপ্ত এলাকায় চাষবাস হত, দোকানপাট তৈরি হত, জমির দাম বাড়ত—তাতে পত্রলোচন সিংহ রায়ের খারাপ না হয়ে বরং ভালোই হত।

ওঁরা সদর দরজার সামনে এসে দাঁড়ালেন। আবহাওয়াতে আশ্চর্যভাবে হেমন্তের আমেজ তৈরি হয়ে গিয়েছিল। শীত-শীত বাতাসে গায়ে কাঁটা দিচ্ছিল।

রমাশঙ্কর চেঁচিয়ে ডাকতে লাগলেন, 'লোচনবাবু! লোচনবাবু!'

ওঁর ডাক শুনে স্পষ্ট মনে হচ্ছিল, কারও তাড়া খেয়ে নিরাপদ

আশ্রয়ের খোঁজে উতলা হয়ে গেছেন।

মিংকি তাড়াহুড়ো করে একছুটে তিন ধাপ সিঁড়ি উঠে ভেজানো দরজায় ধাক্কা দিল।

দরজা সটান খুলে যেতেই ঘরের ভেতরের দৃশ্যটা প্রিয়নাথ দেখতে পেলেন।

মিংকিও যে দৃশ্যটা দেখেছে তাতে কোনও সন্দেহ নেই—কারণ, ও ছিল সবার আগে। বরং রমাশঙ্কর হয়তো দেখতে পাননি—কারণ, তিনি তখন সিঁড়ির ধাপ বেয়ে ওঠার কাজে মাথা ঝুঁকিয়ে ব্যস্ত ছিলেন।

দৃশ্যটা প্রিয়নাথের ভারী অদ্ভুত লাগল।

ঘরের প্রায় মাঝখানে দাঁড়িয়ে পত্রলোচন একজন ভদ্রমহিলা আর একজন যুবকের সঙ্গে কথা বলছিলেন। দরজা খোলার শব্দ পেয়েই ভদ্রমহিলা এবং ছেলেটি শশব্যস্তভাবে চট করে অন্য একটা দরজা দিয়ে বাড়ির অন্দরে চলে গেল।

ঘরের ভেতরে বিকেলে দেখা টেবিলটার ওপরে একটা মোটাসোটা মোমবাতি জ্বলছে। মোমের আলোয় 'আননেসেসারি লম্বা' পত্রলোচন সিংহ রায়ের আরও লম্বা ছায়া দেওয়ালে পড়েছে।

পত্রলোচন যাদের সঙ্গে কথা বলছিলেন তাদের দুজনের চোখেই কালো রঙের সানগ্লাস—সাধারণত ছানি অপারেশানের পর যেরকম চশমা লোকে পরে থাকে।

এক ঝলক দেখে মহিলার যা বয়েস আন্দাজ করা গেল তাতে ছানি অপারেশান করানোটা তার পক্ষে অস্বাভাবিক নয়।

কিন্তু ছেলেটির বয়েস বড়জোর সাতাশ কি আটাশ। তার পক্ষে

ছানি অপারেশানের ব্যাপারটা রীতিমতো অস্বাভাবিক।

এরা দুজনই যদি পত্রলোচন সিংহ রায়ের স্ত্রী এবং ছেলে হয় তা হলে একইসঙ্গে মা ও ছেলের ছানি অপারেশানের ব্যাপারটা শুধু যে অস্বাভাবিক তা নয়, বরং বেশ অদ্ভুত।

রমাশঙ্কর আর প্রিয়নাথ ঘরের ভেতরে ঢুকে পড়েছিলেন। প্রিয়নাথ দরজাটা তাড়াতাড়ি ভেজিয়ে দিলেন।

মিংকি রমাশঙ্করকে ডিঙিয়ে প্রিয়নাথের দিকে তাকাল। ওর চোখে অবাক ভাবটা লুকোনো নেই।

পত্রলোচন ওঁদের ভাবভঙ্গি দেখে কিছু একটা আন্দাজ করে বললেন, 'হিমকুয়াশা। প্রকৃতির পাগলামো। একটু পরে নিজে থেকেই কেটে যাবে।'

মিংকি অন্দরে যাওয়ার খোলা দরজাটার দিকে তাকিয়ে ছিল। সেটা লক্ষ করে পত্রলোচন বললেন, 'আমার ওয়াইফ আর ছেলের সঙ্গে কথা বলছিলাম। ওরা ভীষণ মুখচোরা—অচেনা লোকজনের সামনে বেরোতে চায় না, কারও সঙ্গে কথা বলতে চায় না...।' তারপর ওঁর খেয়াল হল, প্রিয়নাথরা তখন থেকে দাঁড়িয়ে রয়েছেন। তাই সাততাড়াতাড়ি বললেন, 'আরে, আপনারা দাঁড়িয়ে কেন, স্যার, বসুন...।'

প্রিয়নাথ আর রমাশঙ্কর দুটো প্লাস্টিকের চেয়ারে বসলেন।

মিংকি বসল না। বরং হঠাৎই পত্রলোচনকে জিগ্যেস করল, 'আচ্ছা, মিস্টার সিন্‌হা রয়, কিছু মনে করবেন না...মানে...।'

'কী, বলুন—।'

'আপনার ওয়াইফ আর ছেলের চোখে ডার্ক গ্লাসেস দেখলাম

মনে হল...।'

'আপনি ঠিকই দেখেছেন, মিস তেওয়ারি...।' একটা দীর্ঘশ্বাস ফেললেন পত্রলোচন।

'ওঁদের কি ছানি অপারেশান হয়েছে?' আর দেরি না করে ভূতনাথ সরাসরি প্রশ্নটা করলেন।

'না—ক্যাটার‍্যাক্ট অপারেশান হয়নি। ওদের দুজনেরই চোখে একটা পিকিউলিয়ার অসুখ হয়েছে। একটুও আলো সহ্য করতে পারে না। তাই সবসময় সানগ্লাস পরে থাকে...।'

'কী অসুখ? গ্লকোমা?' এবার রমাশঙ্কর জিগ্যেস করলেন।

'ওই টাইপেরই কী একটা রেয়ার অসুখ। নামটা খুব খটোমটো। ট্রিটমেন্ট চলছে...অল্প-অল্প ইমপ্রুভমেন্ট হচ্ছে। দেখা যাক, শেষ পর্যন্ত পুরোটা সারে কি না...।'

কথা বলতে-বলতে পত্রলোচন প্রিয়নাথদের মুখোমুখি এসে বসলেন। মোমবাতির আলোয় একটা দেওয়ালে প্রিয়নাথের ছায়া পড়েছে। পত্রলোচন আর রমাশঙ্করের ছায়া পড়েছে অন্য দুটো দেওয়ালে।

ঘরের ঠান্ডা ভাবটা ক্রমশ কমে আসছিল। হয়তো বাইরের সেই অদ্ভুত কুয়াশা এখন ফিকে হয়ে গেছে।

মিংকিকে দেখে প্রিয়নাথের মনে হল, ওর একটু আগের ভয়-ভয় ভাবটা কেটে গেছে। ও দেওয়ালের পুরোনো ফটোগুলোর ওপরে টর্চের আলো ফেলে ওগুলো খুঁটিয়ে দেখার চেষ্টা করছিল।

প্রিয়নাথ হাতঘড়ির দিকে তাকালেন। রাত সওয়া ন'টা।

তাই দেখে পত্রলোচন জিগ্যেস করলেন, 'রাতের খাওয়া কি

এখন সেরে নেবেন? বলেন তো আপনাদের ঘরে খাবার পৌঁছে দিয়ে আসি...।'

প্রিয়নাথ হেসে বললেন, 'আপনার এখানে এসে থেকে এমন সব ঘটনার সাক্ষী থাকছি যে, খাওয়াদাওয়ার চিন্তা মাথা থেকে উবে গেছে। এখন তো সবে সওয়া ন'টা বাজে—বরং দশটা নাগাদ খাওয়ার কথা ভাবা যাবে। তাতে আপনার কোনও প্রবলেম হবে না তো?'

'না, না, আমার আর প্রবলেম কীসের!'

প্রিয়নাথ একটা সিগারেট ধরালেন। মিংকির দিকে একবার তাকালেন। এখনও ও ফটোগুলোর সামনে ঘোরাঘুরি করছে।

প্রিয়নাথের মুখ থেকে ধোঁয়া বেরোচ্ছিল। সেই ধোঁয়া দেওয়ালে অদ্ভুত ছায়া তৈরি করছিল।

রমাশঙ্কর পত্রলোচনকে জিগ্যেস করলেন, 'একটু আগে যে কুয়াশার ব্যাপারটা অবজার্ভ করলাম সেটা কি প্রায়ই হয়?'

কাশলেন পত্রলোচন। পকেট থেকে বিড়ি বের করে একটা ধরিয়ে ফেললেন। পরপর দুটো টান দেওয়ার পর বললেন, 'বহুদিন ধরে এমনটা হয়। প্রায়ই হয়। তবে কোনও নিয়ম-টিয়ম মেনে হয় না—।'

'বাঃ, তবে তো একরকম ন্যাচারাল ফেনোমেনন বলা যায়...।'

প্রিয়নাথ তেরছা চোখে রমাশঙ্করের মুখের দিকে একবার তাকালেন শুধু, কিছু বললেন না।

পত্রলোচন স্মৃতিচারণ করার সুরে বললেন, 'রাতেরবেলাতেই তো উলটোপালটা কাণ্ডকারখানাগুলোর বাড়বাড়ন্ত হয়। দিনে আর

কতটুকু! ওই কুয়াশার ব্যাপারটা লোক-জানাজানি হওয়ার পর থেকেই সবাই বলতে থাকে, এ-অঞ্চলটায় কুনজর পড়েছে। তারপর একে-একে সব লোকজন ভিটে-মাটি খেত-জমি ছেড়ে চলে যেতে থাকে। তো আপনারা বলবেন আমি একা পরিবার নিয়ে এখানে মাটি আঁকড়ে পড়ে আছি কেন?' বিড়িতে দু-তিনবার ঘন-ঘন টান দিলেন। তারপর ঃ 'আমি তো এখানকার জমিদার! এখানকার রাজা! আমার শরীরে মুকুন্দ রায়ের রক্ত। আমি হার মেনে পালাই কেমন করে? রাজা কি কখনও প্রজার মতো আচরণ করতে পারে? কখখনও না!'

পত্রলোচনের গলার স্বর চড়ছিল। বড়-বড় চোখ দুটো জ্বলজ্বল করছিল।

মিংকি ফটোর দিক থেকে নজর সরিয়ে পত্রলোচনের দিকে ফিরে তাকিয়েছিল।

নিজেকে সামলে নিয়ে তালচ্যাঙা কালো মানুষটা বলল, 'ক'টা রাত এখানে থেকে দেখে যান। দিনেরবেলা কি অতকিছু দেখা যায়! তখন শোনা যায়, দেখা যায় না...।'

'এখানে আপনার থাকতে কোনও অসুবিধে হয় না?' প্রিয়নাথ জিগ্যেস করলেন।

হাসলেন পত্রলোচন ঃ 'ওই যে বললাম...গা সওয়া হয়ে গেছে...।'

ওঁর কথা শেষ হতে না হতেই পায়ের শব্দ শোনা গেল আবার। বেশ কয়েকজোড়া পা পাগলের মতো ছুটে বেড়াচ্ছে। ধপ-ধপ-ধপ-ধপ। সেই ছুটন্ত পায়ের আঘাতের দাপটে ঘরের মেঝে

কাঁপছে।

মিংকি ভয়ের গলায় বলে উঠল, 'ওই...আবার!'

রমাশঙ্কর বললেন, 'আর্থকোয়েক! ভূমিকম্প!'

প্রিয়নাথ হাতের সিগারেটটা তাড়াতাড়ি টেবিলে রাখা হাতল ভাঙা কাপে গুঁজে দিয়ে পাঞ্জাবির পকেট থেকে কম্পাসটা বের করলেন। টর্চের আলো জ্বেলে কম্পাসের কাঁটার গতিপ্রকৃতি তীক্ষ্ণ নজরে দেখতে লাগলেন।

একটু আগে যেমনটা হয়েছিল কাঁটা ঠিক তেমনই এলোমেলোভাবে থরথর করে কাঁপছে।

এটা কি অশরীরী প্রভাবের ইশারা?

কিন্তু রমাশঙ্কর কম্পাসের পাগলামো দেখেও তালির শব্দ করে হাত ঝাড়লেন। হেসে বললেন, 'আর্থকোয়েকের জন্যে আর্থের ভেতরের ডাইপোল নড়ছে...।'

পত্রলোচন ইতস্তত করে বললেন, 'আমি এসবের কোনও কারণ-টারন জানি না। শুধু এরকমটা মাঝে-মাঝে হয়, তাই জানি...।'

এমন সময় প্রিয়নাথ অদ্ভুত একটা ব্যাপার দেখতে পেলেন।

মোমের আলোয় যে-দেওয়ালটায় প্রিয়নাথের ছায়া পড়েছিল সেই দেওয়ালে কতকগুলো কালো ছায়া দিশেহারাভাবে চট করে ছুটে গেল।

সাদা পরদায় কালো সিলুয়েটের মতো ছায়াগুলো যেন কালো কার্ডবোর্ডের কাট আউট। ওরা বিদ্যুৎঝলকের মতো দেওয়ালের একদিক থেকে আর-একদিকে ছুটে চলে গেল। তার মধ্যে একটা

ছায়ার যে মাথা নীচের দিকে, পা ওপরদিকে, সেটাও প্রিয়নাথ খেয়াল করলেন।

প্রিয়নাথ ভেবেছিলেন ব্যাপারটা আর কেউই লক্ষ করেনি।

কিন্তু ওঁর ধারণা যে ভুল সেটা বোঝা গেল মিংকি তেওয়ারির ভয়ংকর তীব্র চিৎকারে।

ওঁর চিৎকারটা কসাইয়ের চপারের কোপে মরণাপন্ন কোনও জন্তুর চিৎকারের মতো শোনাল। এ-চিৎকারে বুকের রক্ত পলকে হিম হয়ে যায়।

দেওয়ালের ছায়াগুলো একনিমেষেই উধাও হয়ে গিয়েছিল। কিন্তু ওদের আবির্ভাবের অভিঘাত প্রিয়নাথের মনে বলতে গেলে সিলমোহরের স্থায়ী ছাপ বসিয়ে দিয়ে গেল।

প্রিয়নাথের মনে হল, চপলকেতুর অন্তরালে যা কিছু রহস্য লুকিয়ে আছে তার ওপর থেকে পরদার আড়াল একে-একে সরে যাওয়ার ব্যাপারটা শুরু হয়েছে।

মিংকি তেওয়ারি তখনও ভাঙা কর্কশ গলায় চিৎকার করে যাচ্ছিল।

ছয়

মিংকির শরীরটা কুঁকড়ে গিয়েছিল। হাতের টর্চ শব্দ করে খসে পড়েছে মেঝেতে। হাত দুটো এখন মুঠো করে বুকের কাছে জড়ো করা। চোখগুলো বড়-বড় করে অভিশপ্ত দেওয়ালটার দিকে

তাকিয়ে আছে। মুখটা সামান্য হাঁ করা।

প্রিয়নাথ ঝট করে চেয়ার ঠেলে উঠে পড়লেন। ছুটে গেলেন মেয়েটার কাছে।

মিংকি প্রিয়নাথের হাত আঁকড়ে ধরল প্রাণপণে। তারপর ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠল।

প্রিয়নাথ ওর মাথায় হাত বুলিয়ে দিতে লাগলেন ঃ 'কাম ডাউন। কাম ডাউন। এত আপসেট হওয়ার কিছু হয়নি। আমি তো আছি। কোনও ভয় নেই...।'

প্রিয়নাথের কথাগুলোয় সেরকম কাজ হচ্ছিল না। কারণ, মিংকির ফোঁপানি কমে এলেও থামেনি। ওর শরীরটা মাঝে-মাঝেই কেঁপে-কেঁপে উঠছিল।

মিংকিকে যত্ন করে ধরে নিয়ে এসে একটা চেয়ারে বসিয়ে দিলেন ভূতনাথ। পাশে একটা চেয়ার টেনে নিয়ে নিজেও বসলেন। তারপর ওর মাথায় আশ্বাসের হাত বোলাতে-বোলাতে রমাশঙ্কর আর পত্রলোচনের মুখের ওপরে চোখ বুলিয়ে নিলেন।

রমাশঙ্কর দত্ত এখনও মুখ খোলেননি। বোধহয় চটজলদি কোনও ব্যাখ্যা খুঁজে পাননি।

আর মুকুন্দ রায়ের বংশধর, এ-অঞ্চলের রাজামশাই পত্রলোচন, পুরোপুরি নির্বিকার। শুধু মেঝেতে দাঁড় করানো একটা জলের বোতল তুলে নিয়ে এগিয়ে দিলেন প্রিয়নাথের দিকে ঃ 'ম্যাডামকে একটু জল-টল খাওয়ান, স্যার...।'

প্রিয়নাথ ভুরু কুঁচকে তাকালেন পত্রলোচনের দিকে। বোধহয় বুঝতে চাইলেন, ওঁর 'ম্যাডাম' এবং 'স্যার' বলার মধ্যে

ব্যঙ্গের কোনও ছোঁওয়া আছে কি না।

. কিছুক্ষণ জরিপ করে মনে হল, না, নেই। তার কারণ, এইমাত্র যে-ঘটনাটা ঘটে গেছে সেটা ওঁর কাছে গা সওয়া এবং নিতান্তই মামুলি। রোজ ডাল-ভাত খাওয়ার মতন।

প্রিয়নাথের হাত থেকে বোতল নিয়ে মিংকি কয়েক ঢোঁক জল খেল। ও তখনও বড়-বড় শ্বাস টানছিল। প্রিয়নাথ বোতল থেকে সামান্য জল হাতের তালুতে ঢেলে নিলেন। তারপর ভয়-পাওয়া মেয়েটার মুখে ছিটিয়ে দিয়ে বললেন, 'মুখটা মুছে নাও, মিংকি...।'

মিংকি ভূতনাথের কথা শুনল, মুখ-টুখ মুছে একটু স্বাভাবিক হওয়ার চেষ্টা করল। পত্রলোচন আর রমাশঙ্করের দিকে সঙ্কোচের দৃষ্টিতে তাকাল।

রমাশঙ্কর এতক্ষণে আমতা-আমতা করে মুখ খুললেন, 'মিস্টার জোয়ারদার, ওই...ওই দেওয়ালটায় কয়েকটা ছায়া...মানে, শ্যাডো দেখা গেল না?'

প্রিয়নাথ কোনও জবাব দিলেন না—অপেক্ষা করতে লাগলেন। তিনি বেশ বুঝতে পারছিলেন, যুক্তিবাদী মানুষটা আচমকা বেশ নাড়া খেয়ে গেছে। ওঁর প্রশ্নের উত্তর দিয়ে ওঁকে সাহায্য করার কোনও দরকার নেই। রমাশঙ্কর ওই দেওয়ালে একটু আগে কী দেখেছেন তা ভালো করেই জানেন।

'ভূতনাথবাবু, ওই দেওয়ালটায় কতকগুলো শ্যাডো যেন...যেন ছুটে চলে গেল বলে মনে হল—।'

প্রিয়নাথ ব্যাপারটা দেখে তেমন ভয় পাননি, তবে বেশ অবাক হয়ে গেছেন। এইরকম 'দেখা' যাওয়ার কথা মিংকিরা ওদের টিভি

প্রোগ্রামে মোটেই বলেনি।

তিনি রমাশঙ্করের দিকে স্থির চোখে কিছুক্ষণ তাকিয়ে থেকে বললেন, 'ন্যাচারাল ফেনোমেনন। ওই দেওয়ালটা হচ্ছে সিনেমার পরদা—তার ওপরে ছায়াছবি দেখা গেল...।'

'ছায়া' শব্দটার ওপরে একটু জোর দিলেন প্রিয়নাথ। ওঁর মুখ দেখে মনে হচ্ছিল, রমাশঙ্করকে যথেষ্ট খোঁচা দিতে পেরেছেন বলে বেশ তৃপ্তি পেয়েছেন।

হঠাৎই ভূতনাথ সিরিয়াস হয়ে উঠলেন। চোখ সরু করে পত্রলোচনের দিকে তাকিয়ে বললেন, 'লোচনবাবু, আপনি কিছু বলুন—।'

'আমি আর কী বলব!' পত্রলোচন মলিন হাসলেন ঃ 'বলবেন তো আপনারা! আপনারা অপ্রাকৃত অতিপ্রাকৃত ঘটনার খোঁজখবর করতে এসেছেন...। আমার তো এসব গা সওয়া...।'

ভূতনাথ উঠে দাঁড়ালেন। দেওয়ালে টাঙানো ফটোগুলোর কাছে গিয়ে টর্চের আলো ফেলে সেগুলো দেখতে লাগলেন। মনে হচ্ছিল, তিনি দেওয়ালের ছায়ার ব্যাপারটা সম্পর্কে জোর করে উদাসীন থাকতে চাইছেন। অন্তত এখন।

মিংকির হাত থেকে খসে পড়া টর্চটা তুলে নিলেন। টর্চটা তখনও জ্বলছিল। দু-হাতে দুটো টর্চ নিয়ে ফটোগুলো বেশ খুঁটিয়ে পরখ করতে লাগলেন।

'এই ফটোগুলো কাদের?' পত্রলোচনের দিকে জিজ্ঞাসা ছুড়ে দিলেন ভূতনাথ।

পত্রলোচন একটা বিড়ি ধরিয়ে উঠে দাঁড়ালেন ঃ 'ওগুলো

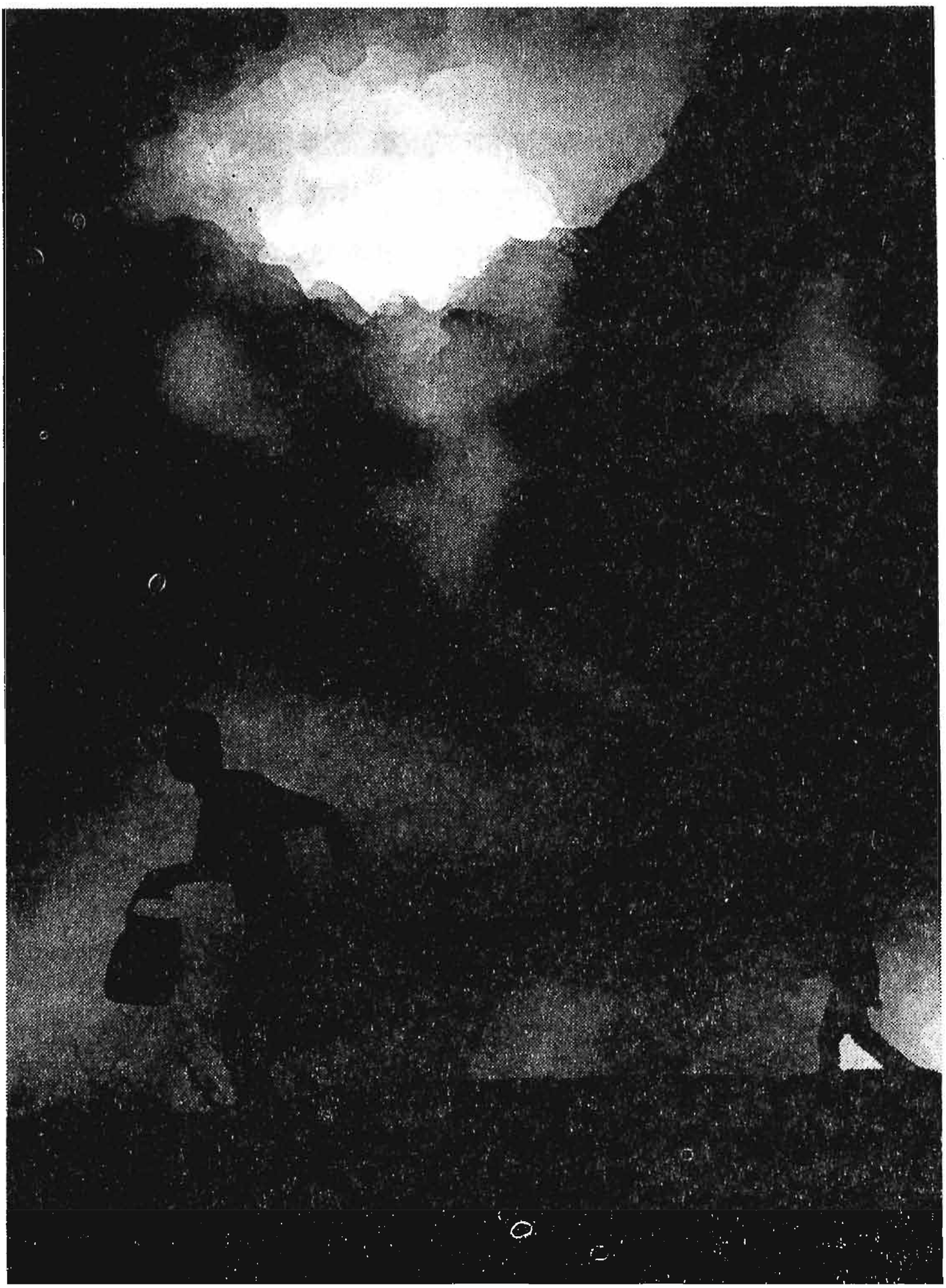

আমার বাপ-দাদাদের ফটো। কবেকার বাঁধানো—সেই খোকা বয়েস থেকে দেখে আসছি...।'

প্রিয়নাথ পাশের দেওয়ালটার দিকে তাকালেন। সেখানে এখন পত্রলোচনের লম্বা ছায়া পড়েছে।

টেবিলের দিকে হেঁটে আসতে-আসতে একটা টর্চ পকেটে ঢোকালেন। মিংকির টর্চটা টেবিলের ওপরে রেখে দিলেন। পকেট থেকে ডিজিটাল ক্যামেরা বের করলেন।

'অভিশপ্ত' দেওয়ালটার কাছে গিয়ে ওটার নানান জায়গা খুঁটিয়ে দেখতে লাগলেন ভূতনাথ।

দেওয়ালটা পুরোনো। ড্যাম্প ধরা। চুন-বালির পলেস্তারা সময়ের চাপে জায়গায়-জায়গায় ঝরে পড়েছে। ফলে দেওয়ালটা কোথাও ফুলে-ফেঁপে উঠেছে, কোথাও বা বসে গেছে।

দেওয়ালটা ছুঁয়ে, হাত বুলিয়ে, পরীক্ষা করছিলেন। অসম্ভব ঠান্ডা। তবে সেটা ড্যাম্পের জন্যও হতে পারে। নাঃ, ওটা ঠান্ডা, পুরোনো এবং কুৎসিত হলেও সত্যিকারের দেওয়াল। কোনও কারচুপি নেই। সিনেমার পরদার মতো এ-দেওয়ালে উলটোদিক থেকে কোনও ছায়া তৈরি করা অসম্ভব।

কয়েক পা পিছিয়ে এসে ভূতনাথ দেওয়ালটার ফটো তুলতে লাগলেন।

মিংকির দিকে আড়চোখে একবার তাকালেন। কেমন এক ভয়ের চোখে প্রিয়নাথের দিকে তাকিয়ে আছে। ভূতশিকারি মানুষটার কর্মকাণ্ড দেখছে।

চোখের কোণ দিয়ে তিনি পত্রলোচনকেও লক্ষ করছিলেন।

নির্বিকার মুখ। চুপচাপ বসে বিড়িতে টান দিচ্ছেন। তাকিয়ে আছেন মোমবাতির শিখার দিকে।

একটু আগে বলা ওঁর কথাগুলো মনে পড়ছিল ঃ 'দিনেরবেলা কি অত কিছু দেখা যায়! তখন শোনা যায়, দেখা যায় না...।'

আর এখন? এই রাতে?

শোনাও যাচ্ছে, দেখাও যাচ্ছে।

মিংকিদের চ্যানেল রাতের কোনও ছবি দেখাতে পারেনি।

প্রিয়নাথের ফটো সেশন যখন চলছে তখন রমাশঙ্কর একটু ধাতস্থ হয়ে উঠে দাঁড়ালেন। পকেট থেকে একটা ছোট্ট লাঠি আর একটা মাঝারি স্ক্রু ড্রাইভার বের করলেন। লাঠিটা অনেকটা কাঁসরঘণ্টা বাজানোর লাঠির মতো। ওঁর মুখের চেহারা দেখে মনে হল, ওঁর ভেতরকার যুক্তিবাদী সত্তা এতক্ষণে মাথাচাড়া দিয়েছে।

বেশ সতর্কভাবে পা ফেলে দেওয়ালটার দিকে এগোতে লাগলেন রমাশঙ্কর। ওঁকে বেশ উত্তেজিত দেখাচ্ছিল। লাঠি ধরা হাতে চশমাটাকে বারবার ঠিক করছিলেন। চোখে-মুখে ঘামের ফোঁটা।

দেওয়ালটার কাছে গিয়ে ঘাড় ঘুরিয়ে প্রিয়নাথের দিকে একবার তাকালেন। তারপর খাটো লাঠিটা ছুরির হাতল ধরার মতো মুঠো করে ধরে লাঠির ডগা দিয়ে দেওয়ালের নানান জায়গায় ঠুকে-ঠুকে দেখতে লাগলেন। মার্বেল পাথর বসানোর সময় মিস্ত্রিভাইরা যেভাবে লাঠি দিয়ে ঠুকে পাথর সেট করে।

প্রিয়নাথ জিগ্যেস করলেন, 'কী দেখছেন, মিস্টার দত্ত?'

'দেখছি ওয়ালটা কোথাও ফাঁপা আছে কি না। ফাঁপা থাকলে

সেখানে কোনও যন্ত্রপাতি ঢুকিয়ে কারচুপি করার স্কোপ পাওয়া যাবে...।'

পত্রলোচন ভাবলেশহীন মুখে প্রিয়নাথদের দিকে তাকিয়ে ছিলেন। ওদের 'গোয়েন্দাগিরি' দেখছিলেন। হাতের বিড়িটা শেষ হয়ে যাওয়ায় টেবিলে রাখা হাতলভাঙা কাপে শেষ টুকরোটা গুঁজে দিলেন।

রমাশঙ্করের ঠোকাঠুকিতে দেওয়ালের চুন-বালির গুঁড়ো খসে পড়ছিল। আর তার সঙ্গে যে-শব্দ পাওয়া যাচ্ছিল তাতে স্পষ্টই প্রমাণ হচ্ছিল যে, দেওয়ালটা সলিড।

প্রিয়নাথের ছবি তোলা শেষ হয়ে গিয়েছিল। পকেট থেকে ছোট কম্পাস বের করে তিনি রমাশঙ্করকে বললেন, 'এবার কাঁটা-কম্পাস দিয়ে একটু চেক করে দেখি। যদি দেওয়ালের ভেতরে লুকোনো যন্ত্রপাতি থাকে, যদি তার পার্ট্স লোহা অথবা ইস্পাতের হয়, তা হলে আমার এই কম্পাসের কাঁটা উত্তর-দক্ষিণে তাক করে থাকার বদলে কমবেশি ডিফ্লেক্টেড হবে। মিংকি—' মিংকির দিকে তাকালেন ভূতনাথ ঃ 'এদিকে এসো না!...আমাকে একটু হেল্প করবে...।'

মিংকিকে সহজ এবং স্বাভাবিক করার জন্য ভূতনাথ ওকে এই অনুরোধ করলেন।

মিংকি 'শিয়োর' বলে ভূতনাথের দিকে এগিয়ে গেল। ওর মুখ থমথমে এবং গম্ভীর। হাসিখুশির 'চিহ্নগুলো' কোথায় যেন মিলিয়ে গেছে।

রমাশঙ্কর ইতিমধ্যে লাঠি ঠোকাঠুকির পর্ব চুকিয়ে প্রিয়নাথের

পাশে চলে এসেছেন এবং প্রিয়নাথের হাতের কম্পাসের ওপরে ঝুঁকে পড়েছেন।

দেওয়ালের প্রায় গা ঘেঁষে, খুব ধীরে-ধীরে, কম্পাসটাকে দেওয়ালের একদিক থেকে আর-এক দিকে নিয়ে গেলেন ভূতনাথ। ওঁর সঙ্গে-সঙ্গে পা মেলালেন রমাশঙ্কর। আর মিংকি কম্পাসটা তাক করে টর্চ ধরে রাখল—যাতে এক সেকেন্ডের জন্যও কম্পাসটা দেখতে ভূতনাথের কোনও অসুবিধে না হয়।

এরকমভাবে বেশ কয়েকবার হাঁটাহাঁটি করলেন। যেন দুটো ল্যাম্পপোস্টের মাঝে এদিক-ওদিক করে মাঞ্জা দিচ্ছেন।

কিন্তু কিছুই পাওয়া গেল না। কম্পাসের কাঁটা একটিবারের জন্যও বেহিসেবি হেঁচকি তুলল না।

প্রিয়নাথের বিস্তৃত কপালে ভাঁজ পড়ল। তিনি আলতো গলায় রমাশঙ্কর দত্তকে বললেন, 'না, দেওয়ালের ভেতরে কিছু নেই। অন্তত কোনও মেশিনপত্তর নেই...।'

'তা হলে কী আছে?' রমাশঙ্কর বিভ্রান্তভাবে প্রশ্নটা করলেন।

'সুপারন্যাচারাল ফেনোমেনন...।'

বিশাল মাপের জীর্ণ ঘরটার ভেতরে মোমবাতির আলো আর অন্ধকার একটা অদ্ভুত চাপ তৈরি করছিল। অন্ধকার আনাচকানাচগুলোর দিকে তাকিয়ে মিংকির কেমন ভয়-ভয় করছিল। এই বুঝি গাঢ় অন্ধকারের ভেতর থেকে কিছু একটা বেরিয়ে আসবে। তারপর...।

'দেওয়ালটা যদি ঘষা কাচের তৈরি হত তা হলেও কিছু একটা ভাবার সুযোগ পাওয়া যেত। ঘষা কাচের ওপাশ থেকে প্রোজেক্টর

ব্যবহার করে সিলুয়েট ইমেজ মানে, শ্যাডো—তৈরি করা সম্ভব।' চিবুকে আঙুল ঘষতে-ঘষতে মিংকি তেওয়ারিকে বলছিলেন ভূতনাথ, 'কিন্তু মিংকি, নাম্বার ওয়ান পয়েন্ট হচ্ছে, ওয়ালটা ঘষা কাচের তৈরি নয়। আর...নাম্বার টু হচ্ছে...প্রোজেকশানের মেশিনারি অপারেট করতে হলে ইলেকট্রিসিটি দরকার—যা এখানে নেই...।'

রমাশঙ্কর বেশ অপ্রস্তুতে পড়ে গেছেন। ওঁর জঙ্গি ভাবটা হাওয়া বেরিয়ে যাওয়া বেলুনের মতো চুপসে গেছে। চপলকেতুতে এসে প্রথম রাতেই এরকম ধাক্কা খাবেন ভাবেননি। কিন্তু এত সহজে রমাশঙ্কর দত্ত হার মানতে রাজি নন। দেওয়ালের ছুটন্ত ছায়াগুলো যদি অলৌকিক ব্যাপারও হয়ে থাকে, তা হলেও তো তার একটা সম্ভব-অসম্ভব ব্যাখ্যা থাকবে।

লাঠি আর স্ক্রু ড্রাইভার পকেটে ঢোকালেন রমাশঙ্কর। তারপর পত্রলোচনের দিকে এগোলেন।

'পত্রলোচনবাবু—।'

পত্রলোচন একটা টুলে বসে দাঁত খুঁটছিলেন। রমাশঙ্করের ডাকে উঠে দাঁড়ালেন। ওঁর দেওয়ালের ছায়াটা লম্বা হয়ে গেল।

'বলুন—।' ওঁর মুখে কোনও ভাবান্তর নেই। যেন ভূত-প্রেত এবং অলৌকিক ব্যাপারস্যাপারে চূড়ান্ত বৈরাগ্য এসে গেছে।

'ওই দেওয়ালটায়...' দেওয়ালটার দিকে আঙুল দেখালেন রমাশঙ্কর ঃ 'একটু আগে যা দেখলাম তার কারণ-টারন কিছু বলতে পারেন?'

'কারণ?' পত্রলোচন যেন একটু অবাক হলেন। কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে প্রিয়নাথ, মিংকি এবং রমাশঙ্করের দিকে এক ঝলক

করে তাকালেন ঃ 'কারণ আমি কী করে বলব! যাঁরা ওসব ঘটান তাঁরাই জানেন। আমি এসব নিয়ে মাথাটাথা ঘামাই না। যখন যা কিছু হয়, হয়। প্রাকৃতিক ব্যাপারের মতো...।'

'প্রাকৃতিক ব্যাপারের মতো মানে?' প্রিয়নাথ অবাক হয়ে জিগ্যেস করলেন।

পত্রলোচন সামান্য শব্দ করে হাসলেন। শব্দটাই শোনা গেল শুধু। মুখটা ছায়ায় ঢাকা থাকায় হাসিটা দেখা গেল না।

আলতো গলায় বললেন, 'এই যে রোজ সূর্য ওঠে, তা নিয়ে কি আমরা মাথা ঘামাই? না। রোজ দেখতে-দেখতে ব্যাপারটা আমাদের সবার গা সওয়া হয়ে গেছে। ওটাকে আমরা প্রাকৃতিক ঘটনা বলে মেনে নিয়েছি। এই ধরুন চাঁদ যে ছোট-বড় হয়, সেটাও তো ন্যাচারাল ব্যাপার! ওটা দেখে আমরা অবাক হই না। তো এইসব কাণ্ডকারখানাও সেইরকম...। ন্যাচারাল ব্যাপার...।'

কথাগুলো বলে পত্রলোচন মোমবাতির দিকে ঘুরলেন ঃ 'আপনারা একটু বসুন। জিরিয়ে নিন। রাত হয়েছে। আমি আপনাদের খাওয়ার ব্যবস্থা করি—।'

প্রিয়নাথরা আবার ফিরে এলেন মোমবাতির কাছে। প্লাস্টিকের চেয়ারগুলোয় বসে পড়লেন।

মিংকি প্রিয়নাথের পাশে-পাশেই ছিল। বসলও প্রিয়নাথের পাশেই। তার পরই চাপা গলায় বলল, 'ঘরে বসে একা-একা খাওয়ার চেয়ে এখানেই আমরা একসঙ্গে বসে ডিনার সেরে নিতে পারি, কী বলেন?'

মিংকির দিকে তাকালেন। মেয়েটার আতঙ্ক এখনও কাটেনি।

এই ভয়টাকে যেভাবে হোক লাগাম দিতে হবে। মুখে বললেন, 'সেটাই ভালো হবে। ঘরে-ঘরে খাওয়ার ব্যবস্থা মানে বাড়তি ঝঞ্ঝাট—।'

প্রিয়নাথ পত্রলোচনকে সে-কথাই বললেন।

পত্রলোচন মাথা নেড়ে বললেন, 'সেটাই ভালো হবে, স্যার। আমারও সুবিধে হবে।' তারপর সামান্য হেসে ইতস্ততভাবে যোগ করলেন, 'অতি সামান্য আয়োজন করতে পেরেছি। আলুভাজা, ডিমের ডালনা, আর গরম-গরম ভাত...।'

প্রিয়নাথ সঙ্গে-সঙ্গে বললেন, 'যথেষ্ট, যথেষ্ট! এটাই আমাদের কাছে রাজভোগ।'

পত্রলোচন 'এখুনি আসছি, স্যার—' বলে অন্দরের দিকের দরজা খুলে চলে গেলেন।

পত্রলোচন চলে যেতেই রমাশঙ্কর প্রিয়নাথকে বললেন, 'আমার মাথাটা কেমন গুলিয়ে যাচ্ছে। এই সব পিকিউলিয়ার ঘটনা ওঁর কাছে ন্যাচারাল ব্যাপার! কী অদ্ভুত!'

প্রিয়নাথ হেসে বললেন, 'আপনার কাছেও তো তাই। ন্যাচারাল ফেনোমেনন।' তিনি বুঝতে পারছিলেন, রমাশঙ্করের যুক্তিবাদের জঙ্গিভাবটা ফিরে আসতে সময় লাগবে।

মিংকির দিকে তাকিয়ে দেখলেন, ও 'সিনেমা' দেখানো দেওয়ালটার দিকে তাকিয়ে রয়েছে।

রমাশঙ্কর বললেন, 'যা-ই বলুন, মিস্টার জোয়ারদার, লোচনবাবুর নির্বিকার ভাবটা কিন্তু বেশ বাড়াবাড়িরকম নির্বিকার। কোনও হেলদোল নেই। সেইজন্যেই মানুষটাকে আমার সন্দেহ হচ্ছে।

হয়তো ও এমন কায়দা করে অবাক কাণ্ডগুলো ঘটিয়েছে যে...।'

রমাশঙ্কর চুপ করে গেলেন। বোধহয় ওঁর নিজের কানেই ওঁর কথাবার্তাগুলো ফিকে ঠেকছিল।

মিংকি নীচু গলায় প্রিয়নাথকে বলল, 'ভূতনাথদা, পত্রলোচনবাবুর এই বাড়িটা যে হন্টেড তাতে কোনও সন্দেহ নেই। যদি মিস্টার দত্ত এই হন্টিং-এর ব্যাপারটা মেনে নেন তা হলে তো মিটেই গেল। আমাদের চ্যানেল উইন করছে, আর মিস্টার দত্ত অ্যাপলজি চেয়ে আমাদের ডিরেক্টরকে একটা চিট্‌ঠি দিয়ে দেবেন—ব্যস।'

'তুমি কী বলতে চাইছ স্পষ্ট করে বলো তো...।' প্রিয়নাথ ভুরু কুঁচকে মিংকির দিকে তাকালেন।

'আমি বলতে চাইছি কি, হন্টিং-এর ব্যাপারটা যদি আমরা—বোথ দ্য পার্টিস—অ্যাকসেপ্ট করে নিই তা হলে তো আর কোনও ডিসপিউট নেই। আমরা কালই কলকাতায় ব্যাক করতে পারি...।'

মিংকি নীচু গলায় কথা বললেও রমাশঙ্কর দত্ত বোধহয় ওর কথার সারমর্ম আঁচ করতে পেরেছিলেন। তাই বললেন, 'না, মিস তেওয়ারি, আমি এখনই হন্টিং-এর ব্যাপারটা অ্যাকসেপ্ট করতে পারছি না। মানছি, আমি খানিকটা ধাক্কা খেয়ে গেছি, কিন্তু এখনও হান্ড্রেড পার্সেন্ট কনভিন্‌স্‌ড হইনি। কাল দিনেরবেলা আমি লোচনবাবুর পারমিশন নিয়ে ওই পিকচার দেখানো ওয়ালটা আর-একবার এগজামিন করব। ওটার পেছনে কারচুপি থাকার ব্যাপারটা আমি এখনও পুরোপুরি উড়িয়ে দিতে পারছি না। কারণ, সব ঘটনারই একটা সায়েন্টিফিক এক্সপ্ল্যানেশান থাকতে হবে। বিজ্ঞান আর যুক্তির কাছে সব কাবু...।'

মিংকি কোনও জবাব দিল না, শুধু প্রত্যাশা নিয়ে ভূতনাথের মুখের দিকে তাকিয়ে রইল।

প্রিয়নাথ কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে মাথা নাড়লেন। তারপর মিংকিকে বললেন, 'তুমি কাল বরং তৃষ্ণাদের কাছে হোটেলে চলে যেয়ো। দ্যাট উইল বি সেফ ফর য়ু—।'

'না, ভূতনাথদা, সেটা হয় না।' আপত্তি করল ভয়-পাওয়া মেয়ে ঃ 'আমি আপনার সঙ্গে থাকব...।'

ভূতনাথ কিছু একটা বলতে যাচ্ছিলেন, কিন্তু তার আগেই পত্রলোচন কাঁসার থালা-গ্লাস নিয়ে ঘরে ঢুকলেন। ছোট টেবিলটার ওপরে কোনওরকমে তিনজনের থালা-গ্লাস সাজিয়ে দিলেন।

তারপর বিনীতভাবে বললেন, 'খুবই ছোট টেবিল। একটু কষ্ট করে মানিয়ে নিন...।'

টেবিলটা সেন্টার টেবিল গোছের হলেও তিনটে থালা আর গ্লাস টায়টোয় এঁটে গিয়েছিল।

জলের বোতল থেকে তিনটে গ্লাসে জল ঢেলে দিলেন। তারপর অন্দরের দরজার কাছে গিয়ে ভাতের হাঁড়ি নিয়ে এলেন। সেটা এনে টেবিলের কাছে রেখে আবার গেলেন অন্দরের দরজার কাছে।

এবারে এল একটা বাটি আর ছোট ডেকচি। তাতে যথাক্রমে আলুভাজা আর ডিমের ডালনা।

বোঝাই যাচ্ছিল, অন্দরে যাওয়ার দরজার কাছে দাঁড়িয়ে পত্রলোচনের স্ত্রী খাবারদাবারগুলো স্বামীর হাতে এগিয়ে দিচ্ছিলেন—কিন্তু প্রিয়নাথরা ওঁকে দেখতে পাচ্ছিলেন না। বোধহয় আড়ালটাই ভদ্রমহিলা পছন্দ করছিলেন।

প্রিয়নাথের অস্বস্তি হচ্ছিল। যিনি এত কষ্ট করে তিনজন অতিথির জন্য রান্নাবান্নার ধকল পোয়ালেন তাঁকে ধন্যবাদ জানানোর সুযোগটাই পাওয়া যাচ্ছে না!

সে-কথাই তিনি বললেন পত্রলোচনকে।

উত্তরে পত্রলোচন মিনমিন করে জবাব দিলেন, 'কী বলব, বলুন! ও এতই লাজুক আর মুখচোরা যে, অচেনা কারও সামনে আসতেই চায় না।'

মিংকিরা খাওয়া শুরু করে দিয়েছিল। অনেকক্ষণ ধরেই তিনজনের খিদে পাচ্ছিল। খিদের মুখে আলুভাজা, ডিমের ডালনা আর গরম ভাত রীতিমতো অমৃত বলে মনে হচ্ছিল।

পত্রলোচন আবার অন্দরের দরজার দিকে যেতেই রমাশঙ্কর দত্ত চাপা গলায় মন্তব্য করলেন, 'ওঁর ওয়াইফের কিছু একটা ব্যাপার আছে, বুঝলেন।'

'কী ব্যাপার?' প্রশ্নটা করে আলুভাজা আর ডিমের ঝোল ভাতের সঙ্গে মেখে এক গ্রাস মুখে পুরে দিলেন প্রিয়নাথ।

'এই যে সব আনন্যাচারাল ফেনোমেনা। দেখুন গে, সে-ই হয়তো আড়ালে বসে কলকাঠি নাড়ছে!'

সাত

চপলকেতুতে সূর্যোদয় দেখবেন বলে খুব ভোরে ঘুম থেকে উঠেছিলেন ভূতনাথ। ঘর থেকে বেরিয়ে বাঁ-দিকের আকাশে চোখ

রাখতেই দেখতে পেয়েছেন লালচে আকাশ। আর তার কিছুক্ষণ পরেই দেখা দিয়েছেন সূর্যদেব। প্রায় দিগন্তরেখার কাছাকাছি।

রমাশঙ্কর দত্তর কথা মনে পড়ল। ন্যাচারাল ফেনোমেনন। মনে পড়ল, পত্রলোচনের কথাগুলোও।

ভোরের পাখির ডাক প্রিয়নাথকে অভ্যর্থনা জানাচ্ছিল। ওরা খাবারের খোঁজে এদিক-ওদিক উড়ে যাচ্ছিল।

দূরে দেখা যাচ্ছে একটা ভাঙাচোরা বাড়ি। তাকে ঘিরে অনেক গাছপালা। চপলকেতুর ম্যাপের হিসেবমতো ওই বাড়িটা ছাড়িয়ে এগিয়ে গেলে একটা পুকুর পাওয়া যাবে।

কাল রাতের ঘটনাগুলোর কথা ভেবে প্রিয়নাথের কপালে ভাঁজ পড়েছিল। রাতের তুলনায় দিনেরবেলাটা কত আলাদা! নাঃ, আজ দিনেরবেলা এলাকাটা একটু ভালো করে ঘুরে দেখতে হবে। যে-প্রমাণের খোঁজে প্রিয়নাথ এখানে এসেছেন তা পাওয়ার কাজ গতকাল রাত থেকেই শুরু হয়ে গেছে। কিন্তু যত প্রমাণ পাওয়া যায় ততই ভালো। কারণ, রমাশঙ্কর দত্ত যতই যুক্তিবাদী হোন না কেন একইসঙ্গে এঁড়ে তর্কপ্রিয়। কোনও অলৌকিক ঘটনাকে অলৌকিক বলে মেনে নিতে ওঁর সমস্যা আছে। ওঁকে এ জাতীয় কিছু বিশ্বাস করানো বেশ কঠিন।

ঘরে ফিরে এসে তাড়াতাড়ি তৈরি হতে লাগলেন প্রিয়নাথ। সাড়ে ন'টায় তৃষ্ণা, বিনোদকুমার ওদের আসার কথা। তারপর টাটা সুমো নিয়ে পত্রলোচনের ভূতুড়ে অঞ্চলটা ঘুরে দেখতে হবে। ভূত, প্রেত বা অপদেবতার অস্তিত্বের প্রমাণ খুঁজতে হবে। এমন প্রমাণ, যে-প্রমাণটা রমাশঙ্কর দত্তের মতো কট্টর যুক্তিবাদী

মানুষও মেনে নেবে।

প্রিয়নাথদের ঘরগুলোর পাশেই রয়েছে একটা বাথরুম আর কলতলা। সেখানে টিউবওয়েল লাগানো আছে। প্রিয়নাথদের সেরকম কোনও অসুবিধে হয়নি। রাতে বাথরুমে যাওয়ার সময় সঙ্গে টর্চ নিয়েছেন। শুধু মিংকির বেলায় প্রিয়নাথকে টর্চ হাতে সিকিওরিটির কাজ করতে হয়েছে।

সারারাত মিংকি ঘুমোতে পারেনি—বলতে গেলে জেগেই ছিল। শুতে যাওয়ার আগে প্রিয়নাথকে বলেছে, 'ভূতনাথদা, একটা আর্নেস্ট রিকোয়েস্ট। রাতে আপনার ঘরের দরজাটা প্লিজ লক করবেন না। যদি আমাকে টয়লেটে যেতে হয় তা হলে আপনাকে ডাকব। আর ডর লাগলেও ডাকব। ওকে?'

ভূতনাথ হেসে ওকে ভরসা দিয়েছেন।

রাতে ভূতুড়ে ব্যাপার ঘটেনি। শুধুমাত্র ওই ছুটোছুটির শব্দটাই যা বারকয়েক ট্রাব্‌ল দিয়েছে।

ন'টা বাজার দশমিনিট আগেই প্রিয়নাথ তৈরি হয়ে ঘর থেকে বেরোলেন। গায়ে গতকাল রাতের পোশাক ঃ বাদামি রঙের হাতকাটা পাঞ্জাবি আর সাদা পাজামা। কাঁধে অফ হোয়াইট কাপড়ে তৈরি একটা ঝোলা ব্যাগ। তার ভেতরে ভূতশিকারির অস্ত্রশস্ত্র।

মিংকির ঘরের কাছে গিয়ে দুবার ওর নাম ধরে ডাকলেন। ঘরের বন্ধ দরজার ওপিঠ থেকে জবাব এল, 'ব্যস, অওর দো মিনট, ভূতনাথদা...।'

তখনই রমাশঙ্কর ওঁর ঘর থেকে বেরিয়ে এলেন। ছাই রঙের প্যান্ট, হালকা নীল আর কালো স্ট্রাইপ দেওয়া শার্ট। হাতে একটা

কালো ব্যাগ। মুখে কী একটা ক্রিম মেখেছেন। একহাত দূর থেকেও তার গন্ধ পাচ্ছিলেন প্রিয়নাথ।

চারপাশটা একবার চোখ বুলিয়ে নিয়ে রমাশঙ্কর বললেন, 'সকালটা বেশ। মনটা ফ্রেশ করে দেয়...।'

'হুঁ—রাতটাই যত ঝামেলার।'

রমাশঙ্কর একটু অবাক হয়ে প্রিয়নাথের দিকে তাকালেন। কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে বললেন, 'আজ কুয়াশার ওই জায়গাটায় চেক করতে যাবেন তো?'

প্রিয়নাথ সায় দিয়ে মাথা নাড়লেন ঃ 'হ্যাঁ—যাব। আরও অনেকগুলো স্পটেই যাব। ভূত-প্রেত থাক বা না থাক, চেক করতে দোষ কী।'

রমাশঙ্কর কিছু একটা বলতে যাচ্ছিলেন, কিন্তু হঠাৎই পত্রলোচনকে দেখতে পেয়ে চুপ করে গেলেন।

পত্রলোচনের পরনে লুঙ্গি আর হাফশার্ট। মুখে সামান্য হাসি ফুটিয়ে মানুষটা প্রিয়নাথদের কাছে এগিয়ে এল।

'স্যার, সামান্য চায়ের ব্যবস্থা করেছি। চলুন, একটু চা-টা খেয়ে তারপর কাজে নামবেন।'

'আপনি যান, মিংকি রেডি হয়ে বেরোলেই আমরা যাচ্ছি।' প্রিয়নাথ বললেন।

চলে যেতে গিয়েও ঘুরে দাঁড়ালেন পত্রলোচন ঃ 'ও, ভালো কথা—রাতে আপনাদের কোনওরকম অসুবিধে হয়নি তো?'

'না, হয়নি।'

'ভালো...ভালো...।' বলতে-বলতে পত্রলোচন চলে গেলেন।

রমাশঙ্কর দত্ত মুখের একটা ভঙ্গি করে বলে উঠলেন, 'অসুবিধে হলেই বা উনি কোন ঘণ্টা করতেন! ওঁর কাছে সবই তো ন্যাচারাল ফেনোমেনন!'

প্রিয়নাথ হেসে ফেললেন। ভাবলেন, আপনা দাওয়াই আপনা ঘাড়ে।

এমন সময় মিংকি বেরিয়ে এল ঃ 'চলিয়ে, ভূতনাথদা, আই অ্যাম রেডি—।'

'চলো, চলো, চায়-পানির ডাক এসেছে।' প্রিয়নাথ হেসে বললেন।

মিংকির পায়ে ব্লু জিন্‌স, গায়ে থ্রি-কোয়ার্টার হাতাওয়ালা ঘিয়ে রঙের টপ।

ওঁরা তিনজনে আবার সেই ঘরে এসে ঢুকলেন। যে-ঘরটাকে এখন ব্যবহারের ধরন মনে রাখলে ড্রয়িংরুম কাম ডাইনিংরুম বলা যায়।

প্রিয়নাথ জোয়ারদার ঘরটাকে বেশ খুঁটিয়ে দেখছিলেন। গতকাল বিকেলে যখন ঘরটায় প্রথম পা রেখেছিলেন তখন ঘরটাকে ততটা গুরুত্ব দিয়ে দেখেননি। কিন্তু কাল রাতের ঘটনার পর ঘরটাকে এখন অতি সহজেই 'অকুস্থল' বলা যায়। গতকালের সবকিছুই আজ সকালে একইরকম আছে, অথচ তাও যেন মনে হল কোথায় যেন একটা অদৃশ্য মাত্রা যোগ হয়ে গেছে।

পত্রলোচন নির্বিকারভাবে একটা চেয়ারে বসে বিড়ি টানছিলেন। ওঁদের তিনজনকে দেখে মুখে একচিলতে হাসি ফুটিয়ে উঠে দাঁড়ালেন ঃ 'আসুন স্যার...আসুন ম্যাডাম...।' করে বিনীত অভ্যর্থনা

জানালেন।

'পাঁচমিনিট বসুন, আমি এখুনি চা-বিস্কুটের ব্যবস্থা করছি...।' বলে পত্রলোচন চলে গেলেন।

মিংকি গতকাল পত্রলোচনকে বলেছে যে, ওদের জন্য ব্রেকফাস্টের কোনও ব্যবস্থা হবে না। কারণ, ওদের প্যাকেট ব্রেকফাস্ট বর্ধমানের হোটেল থেকে আসবে। তৃষ্ণা আর বিনোদকুমার নিয়ে আসবে।

দুপুরের খাওয়া আর বিকেলের চায়ের ব্যাপারটাও প্রায় সেইরকম। টাটা সুমো নিয়ে ওরা সবাই দোকানপাটে জমজমে কোনও এলাকায় গিয়ে সেগুলো সেরে নেবে।

পত্রলোচন তখন কাচুমাচু মুখে বলেছেন, 'আপনাদের যেরকম মরজি।'

প্রিয়নাথ চটপটে পা ফেলে 'সিনেমা দেখানো' দেওয়ালটার কাছে গেলেন। ওটার ওপরে হাত রেখে ভালো করে উষ্ণতা অনুভব করলেন। না, এখন আর গতকাল রাতের হিমঠান্ডা ব্যাপারটা নেই।

রমাশঙ্কর সাততাড়াতাড়ি পা ফেলে চলে গেলেন দেওয়ালটার কাছে। ভূতনাথকে নকল করে দেওয়ালে হাত বোলাতে লাগলেন।

কিছুক্ষণ পর প্রিয়নাথের দিকে তাকিয়ে ঠোঁট উলটে মাথা নাড়লেন ঃ 'না, মিস্টার জোয়ারদার, কোনও টাইপের ভাইব্রেশান ফিল করা যাচ্ছে না—।'

প্রিয়নাথ সিরিয়াস মুখে বললেন, 'ও, তাই! আমি ভাইব্রেশান চেক করছিলাম না, টেম্পারেচার চেক করছিলাম...।'

রমাশঙ্কর একটু অপ্রস্তুতে পড়ে গেলেও পরিস্থিতি সামলে নেওয়ার চেষ্টা করলেন। টেবিলের দিকে ফিরে আসতে-আসতে বললেন, 'কালকের ব্যাপারটা আমি ডিটেইল্‌সে খাতায় নোট করেছি। তার সঙ্গে পসিব্‌ল এক্সপ্ল্যানেশান হিসেবে বেশ কয়েকটা থিয়োরিও লিখেছি।'

মিংকি প্রশ্ন করল, 'কী থিয়োরি? আমাদের বলা যাবে?'

'কেন নয়!' শব্দ করে হাত ঝেড়ে রমাশঙ্কর একটা চেয়ারে বসে পড়লেন। তারপর ওঁর থিয়োরিগুলো বলতে লাগলেন।

একটা থিয়োরি হল, ওই দেওয়ালটার উলটোদিকের দেওয়ালের কোনও ফুটো থেকে ওই ছুটন্ত মানুষের ছবি পলকের জন্য অভিশপ্ত দেওয়ালে প্রজেক্ট করা হয়েছে।

তখন প্রিয়নাথ বললেন যে, শুধু উলটোদিকের দেওয়াল কেন, ঘরের কোনও দেওয়ালেই প্রজেক্টরের আলো ফেলার জন্য কোনও ফুটো নেই।

রমাশঙ্করের দ্বিতীয় থিয়োরি হল, কাপড়ের পরদায় আঁকা কোনও সিলুয়েট ছবি কেউ চটজলদি এপাশ থেকে ওপাশে টেনে নিয়ে গেছে।

তখন মিংকি হাসি চেপে বলল, 'কে টেনে নিয়ে যাবে? কাউকে তো দেখা যায়নি—!'

রমাশঙ্কর হাল ছাড়ার পাত্র নন। জেদি গলায় বললেন, 'দেখুন, এসব যে সুপারন্যাচারাল ব্যাপার সেটা আমি কিন্তু এখনও মেনে নিতে পারছি না। আই অ্যাম ইয়েট টু বি কনভিন্‌স্‌ড। এলাকাটাকে আমি তন্নতন্ন করে প্রোব করব, তারপর ছাড়ব। ভূত, প্রেত,

কারচুপি যা-ই থাকুক সেসব আমি এক্সপোজ করবই করব।'

এইসব কথাবার্তা কিংবা কথাকাটাকাটির মধ্যেই পত্রলোচন একটা স্টিলের থালায় করে চা-বিস্কুট নিয়ে হাজির হয়ে গেছেন। কথাবার্তার শেষটুকু শুনতে পেলেও মিংকি ওঁর মুখের দিকে তাকিয়ে দেখল, মানুষটা নির্বিকার।

পত্রলোচন হাতপাখা এগিয়ে দিয়েছিলেন। কিন্তু গতকাল রাতের তুলনায় আজ সকালে গরমটা কম লাগছিল। সেইজন্য প্রিয়নাথ আর হাতপাখা নেননি।

রমাশঙ্কর দত্ত চোয়াল শক্ত করে চায়ের কাপে চুমুক দিচ্ছিলেন। প্রিয়নাথ ওঁকে আড়চোখে লক্ষ করছিলেন। মাঝে-মাঝে রমাশঙ্করের চোখ চলে যাচ্ছিল সেই দেওয়ালটার দিকে।

চা খাওয়া পুরোপুরি শেষ করে ওঠার আগেই গাড়ির হর্ন বেজে উঠল। তৃষ্ণারা এসে গেছে।

পত্রলোচনকে ওঁদের সঙ্গী হওয়ার জন্য প্রিয়নাথ আগেই বলে রেখেছিলেন। তাতে পত্রলোচনের প্রতিক্রিয়া ছিল টগবগে।

'আমার জমিদারিতে আপনারা ঘুরবেন, ইন্সপেকশন করবেন—তো আমি সঙ্গে যাব না!'

পাঁচ-সাত মিনিটের মধ্যেই সবাই তৈরি হয়ে গাড়িতে উঠে বসলেন। চা খাওয়া শেষ করার পরপরই ভূতনাথ একটা উইল্‌স ফিলটার ধরিয়েছিলেন। সেটার অবশেষ ছুড়ে ফেলে দিয়ে চপলকেতুর ম্যাপটা কোলের ওপরে খুলে বসলেন।

বিনোদকুমারের কানে ছিপি গোঁজা। গানের তালে-তালে মাথা নাড়ছে। মিংকি তৃষ্ণাকে পেয়ে নীচু গলায় ওর কাল রাতের

অভিজ্ঞতা শোনাচ্ছে। রমাশঙ্কর ওঁর কালো ব্যাগটা খুলে কীসব কাগজপত্র চেক করছেন। আর পত্রলোচন চুপচাপ নির্বিকার। গাইড হিসেবে কাজ করার সুবিধে হবে বলে বিজয় রাধের পাশে বসেছেন।

প্রিয়নাথ ওঁকে লক্ষ করে বললেন, 'আমরা কিন্তু পুরো এলাকাটা ঘুরে দেখব। মন্দিরগুলো, চণ্ডীমণ্ডপ আর নাটমঞ্চ, চারটে পুকুর। আপনার অন্য তিনটে বাড়ি...।'

ঘাড় ঘুরিয়ে প্রিয়নাথের দিকে তাকালেন পত্রলোচন ঃ 'অবশ্যই, স্যার, অবশ্যই...।'

'আপনি একটু আমাদের পাইলট বিজয়কে বলে দিন। ও আপনার ডিরেকশান মতো চালাবে—।'

গাড়ির এসি বন্ধ। জানলা খোলা। তাই বাতাস ঢুকছিল। প্রিয়নাথ বাইরের দিকে শূন্য চোখ মেলে ভাবছিলেন। রমাশঙ্কর চুপচাপ গুম হয়ে বসেছিলেন।

পত্রলোচন একটা বিড়ি ধরালেন। থেকে-থেকেই বিজয় রাধেকে নির্দেশ দিতে লাগলেন। বিনোদকুমার কখন যেন ওর ক্যামেরা চালু করে দিয়েছে। বোধহয় এই কারণেই ও মিংকি আর তৃষ্ণাকে টাটা সুমোর পিছনের চেম্বারে ঠেলে দিয়ে নিজে প্রিয়নাথদের পাশে মাঝের রো-তে বসেছে। ওর ক্যামেরা পালা করে সবাইকে ধরছিল। তবে পত্রলোচন, প্রিয়নাথ আর রমাশঙ্করকেই ধরছিল বেশি। এ ছাড়া যে-রাস্তা ধরে গাড়ি চলছিল সেটাকেও মাঝে-মাঝে ভিডিয়োতে বন্দি করছিল।

প্রিয়নাথের নির্দেশে বিজয় খুব ধীরে গাড়ি চালাচ্ছিল। কারণ,

প্রিয়নাথ দুপাশের হালহকিকত পরখ করতে চাইছিলেন।

পথের দুপাশে ধু-ধু পরিত্যক্ত জমি। দেখে বোঝা যায় এককালে চাষবাস হত, এখন শুধুই আগাছা আর পরগাছা। এ ছাড়া রয়েছে বিস্তীর্ণ মাঠ—যেখানে সবুজের কোনও ছোঁওয়া নেই—শুধু ধূসর ধুলোমাটি।

চলার পথে নাটমঞ্চ আর একটা ভাঙাচোরা মন্দিরকে পাশ কাটিয়ে টাটা সুমো গিয়ে থামল একটা বড় পুকুরের কাছে।

গাড়ি থেকে সবাই নেমে পড়ল। বিনোদকুমার ক্যামেরা বাগিয়ে ওর কাজ শুরু করল।

পত্রলোচন প্রিয়নাথের কাছে এসে দাঁড়ালেন। পুকুরটার দিকে আঙুল দেখিয়ে বললেন, 'এই পুকুরটা থেকেই আমার এলাকা শুরু। এটা হল পশ্চিম দিক। আমার জমিদারি এলাকাটা পুবে-পশ্চিমে লম্বা, বরং উত্তর-দক্ষিণে অনেক খাটো...।'

প্রিয়নাথ পুকুরের কাছে এগিয়ে গেলেন। ওঁর পিছনে বিনোদকুমার।

পুকুরের জলের রং নীলচে সবুজ। হয়তো জলের গাছ আর শ্যাওলাই এর কারণ। প্রিয়নাথ স্থির নজরে জলটাকে লক্ষ করছিলেন।

জল নড়ছে। জলে মুখ বের করে ভেসে থাকা কোনও মাছ হঠাৎ করে ডুব দিয়ে অদৃশ্য হয়ে গেলে যেমনটা হয়।

ঝোলা ব্যাগ থেকে ডিজিটাল ক্যামেরা বের করলেন প্রিয়নাথ। পুকুরের পরপর কয়েকটা ছবি তুললেন। রমাশঙ্কর দত্তও বেশ তৎপরভাবে ভূতনাথকে নকল করতে লাগলেন।

পত্রলোচন প্রিয়নাথের কাছ থেকে বেশ খানিকটা দূরে দাঁড়িয়ে ছিলেন। প্রিয়নাথ ওঁর দিকে ঘুরে তাকিয়ে গলা তুলে জিগ্যেস করলেন, 'এ-পুকুরে বড় মাছ আছে নাকি? রুই-কাতলা-মৃগেল টাইপের?'

হাসলেন পত্রলোচন ঃ 'এককালে অবশ্যই ছিল। তা এখন কি আর আছে! আমি তো বহুবছর এর কোনও যত্নআত্তি করি না। আকাশের নীচে হেলাফেলায় পড়ে আছে। যে সে মাছ ধরতে পারে। আবার ফলিডলও ঢালতে পারে। একমাত্র ভগবানই জানেন!' আকাশের দিকে হাত তুলে কথা শেষ করলেন।

কিন্তু ওঁর কথার ধরনটা প্রিয়নাথের কানে একটু কেমন-কেমন বাজল। ভদ্রলোক যেন বড্ড বেশি নির্বিকার নিস্পৃহ ভাব দেখাচ্ছেন। এটাই কি ওঁর আসল চেহারা?

পুকুরপাড়ে বেশ কয়েকটা কলাগাছ। সেগুলো থেকে খানিকটা দূরে তিনটে খেজুরগাছ। এ ছাড়া বেশিরভাগটাই আগাছার খাটো ঝোপ। সকালের রোদে কলাপাতা থেকে আলো ঠিকরে বেরোচ্ছে। তাদের ছায়া মাটিতে হিজিবিজি কেটেছে।

পুকুর ডিঙিয়ে একটু দূরে তাকালে বেশ কয়েকটা ধানখেত আর ঘর চোখে পড়ছে। ঘরগুলোকে কুঁড়েঘর বলাই ভালো। কোনওটায় টালির ছাউনি আর কোনওটা নিতান্তই খড়ে ছাওয়া। বোঝাই যায়, পত্রলোচনের 'হন্টেড' এলাকা এই পুকুর পেরিয়েই শেষ হয়ে গেছে। তাই সেখানে চোখে পড়ছে ঘরবাড়ি আর চাষবাস।

রমাশঙ্কর দত্ত প্রিয়নাথের কাছে এসে জিগ্যেস করলেন, 'মিস্টার

জোয়ারদার, পুকুরটার মধ্যে কোনও সিম্প্‌টম পেলেন নাকি?'

'কীসের সিম্পটম?' প্রিয়নাথ ভুরু কপালে তুলে জানতে চাইলেন। বেশ বোঝা যাচ্ছিল, রমাশঙ্কর ক্রমেই ওঁর কাছে উপদ্রবের চেহারা নিচ্ছেন।

'হন্টিং-এর সিম্প্‌টম...।'

প্রিয়নাথ ঠান্ডা চোখে যুক্তিবাদের দাদামশাইয়ের দিকে তাকিয়ে রইলেন। কিছুক্ষণ পরে বললেন, 'এখনও পাইনি। পেলে আপনাকে জানাব, এবং আপনার কাছ থেকে তার সায়েন্টিফিক এক্সপ্ল্যানেশানও জেনে নেব...।'

রমাশঙ্কর দত্ত একটু কিন্তু-কিন্তু করে ভূতনাথের কাছ থেকে সরে এলেন।

বেশ খানিকটা দূরে দুটি মানুষকে চোখে পড়ল। কুঁড়েঘরগুলোর দিক থেকে প্রিয়নাথদের দিকেই হেঁটে আসছে। একজন লোক, আর তার সঙ্গে বছর দশ-বারোর একটি ছেলে। দুজনেরই খালি গা। বোধহয় গাড়ি আর লোকজন দেখে কৌতূহলী হয়ে দেখতে আসছে।

কিন্তু ওরা বেশ কিছুটা এগিয়ে আসার পর দেখা গেল, লোকটির হাতে কয়েকটা বাসনপত্র। আর ছেলেটির হাতে দড়ি-বালতি—কুয়ো থেকে জল তোলার জন্য যেমন ব্যবহার করা হয়।

প্রিয়নাথ সিগারেট ধরিয়েছিলেন। সিগারেটের ধোঁয়া ছাড়তে-ছাড়তে মানুষ দুজনকে লক্ষ করতে লাগলেন।

পুকুরের বিপরীতদিকে এসে ওরা থামল। সতর্ক পা ফেলে

দুজনেই পাড় বেয়ে নেমে গেল পুকুরের জলের কাছাকাছি। বারবার প্রিয়নাথদের দিকে দেখতে লাগল।

লোকটা হাতের বাসনপত্র পুকুরপাড়ে একটা জায়গায় নামিয়ে রাখল। পুকুরের এপার থেকেও প্রিয়নাথ লক্ষ করলেন, সেখানে বড় একটা বোল্ডার পাতা। তার ওপরেই বাসনগুলো রেখেছে লোকটা।

এরপর ছেলেটা হাতের বালতিটা ছুড়ে দিল পুকুরের জলে। দড়ির অন্য প্রান্তটা ধরে রইল। তারপর দড়ি ধরে বালতিটা নাড়াচাড়া করে তাতে জল ভরতি করে ওটাকে টেনে তুলল। ঠিক যেন কুয়ো থেকে জল তুলছে।

পুকুর থেকে এভাবে জল তুলতে প্রিয়নাথ কাউকে কখনও দেখেননি।

তিনি তাজ্জব হয়ে গেলেন। ঘুরে তাকিয়ে দেখলেন, দৃশ্যটা বাকিদেরও অবাক করে দিয়েছে। শুধু পত্রলোচন সিংহ রায় ভাবলেশহীন মুখে বিড়িতে টান দিচ্ছেন।

বালতি থেকে জল নিয়ে লোকটি বাসন ধোয়ার কাজ শুরু করল। ছোট ছেলেটা দাঁড়িয়ে-দাঁড়িয়ে সেটা দেখছিল।

প্রিয়নাথের চোখে-মুখে উত্তেজনার ছায়া দেখা গেল। সিগারেটটা চট করে ফেলে দিয়ে তিনি মিংকির দিকে তাকালেন।

'মিংকি, আমি একটু আসছি। ওই দুজন লোকের সঙ্গে একটু একা কথা বলব...।'

'ওকে, ভূতনাথদা—' ঘাড় নেড়ে বলল মিংকি।

বিনোদকুমার ক্যামেরা নিয়ে ওঁকে অনুসরণ করতে যাচ্ছিল,

প্রিয়নাথ ওকে হাতের ইশারায় বারণ করলেন। তারপর তাড়াতাড়ি পায়ে পুকুরের পাড় ধরে হাঁটা দিলেন।

রমাশঙ্কর দত্তও প্রিয়নাথকে অনুসরণ করা শুরু করেছিলেন, কিন্তু ওঁকে বাধা দিল মিংকি ঃ 'আপনি শোনেননি ভূতনাথদা কী বললেন? আপনার যদি ওদের সঙ্গে কথা বলতে হয় তা হলে আপনি পরে যান। ডোন্ট ডিস্‌টার্ব ভূতনাথদা—।'

রমাশঙ্কর থমকে গেলেন।

মিনিট দুয়েকের মধ্যে প্রিয়নাথ ওদের কাছে পৌঁছে গেলেন। পুকুরের পাড়ে কয়েক পা নেমে লোকটির সঙ্গে কথা বললেন।

'নমস্কার। আমরা কলকাতা থেকে আসছি—।'

লোকটি বাসন ধোওয়া থামিয়ে ডানহাতটা কপালের কাছে তুলে নমস্কার এবং সেলামের মাঝামাঝি কিছু একটা করল।

পুকুরপাড় ধরে হেঁটে যাওয়ার সময় প্রিয়নাথ ভাবছিলেন, নিজেদের ঠিক কী পরিচয় দিলে স্থানীয় লোকটির মনে কোনও সন্দেহের কাঁটা ফুটবে না।

'আমার নাম প্রিয়নাথ জোয়ারদার। একটা কোল্ড স্টোরেজ খুলব বলে এখানে জমি দেখতে এসেছি। ওই যে, ওই লম্বামতন ভদ্রলোক—' আঙুল তুলে পুকুরের ওপারে দাঁড়ানো পত্রলোচন সিংহ রায়ের দিকে দেখালেন ঃ 'উনিই জমির মালিক। আমাদের জমি দেখাচ্ছেন। আমরাও তাই জমির ছবি-টবি তুলে নিচ্ছি। পরে ওঁর বাড়িতে বসে দরদাম হবে।'

প্রিয়নাথকে দেখে প্রথমে লোকটির কপালে যেসব ভাঁজ-টাজ পড়েছিল সেগুলো এখন মিলিয়ে গেল। বাসন মাজা ছেড়ে সোজা

হয়ে উঠে দাঁড়াল।

'এখানে কোল্ড ইস্টোরেজ করবেন কী! এখানে তো বিজলি নেই!'

'জানি। আমরা এ-গ্রামে বিজলি আনার ব্যবস্থা করব। তারপর কোল্ড স্টোরেজ—।'

'অ—।' বলে চুপ করে গেল লোকটা।

তারপর জানাল, ওর নাম জপেশ্বর মালিক। সঙ্গে ওর ছেলে মামুন। ওর বউয়ের কাল থেকে বেশ জ্বর। তাই ও ছেলেকে নিয়ে বাসন মাজতে এসেছে। নইলে এই কাজটা রোজ ওর বউ করে।

জপেশ্বরের কালো পাকানো চেহারা। মাথায় চুল কম। সামনের দিকে দুটো দাঁত নেই। নাকটা ভোঁতা।

ছেলের মুখে আর চেহারায় বাপের ছাঁচ বসানো। চোখ দুটো বড়-বড়। কৌতূহলে ভরা।

'পুকুরে দড়ি-বালতি ফেলে জল তুলে বাসন মাজছেন? পুকুরে কোনও বিপদ-আপদ আছে নাকি?'

'বিপদ-আপদ?' বলে জপেশ্বর মাথা চুলকোতে লাগল। পুকুরের ওপারে দাঁড়ানো লোকজনের দিকে তাকাল।

ওর ইতস্তত ভাব দেখে ভূতনাথ আবার জিগ্যেস করলেন, 'কুমির কিংবা হাঙর-টাঙর আছে নাকি?'

জপেশ্বর একটু লজ্জা পেয়ে হেসে ফেলল। মাথা নীচু করে বলল, 'না, না, বাবু—ওসব এই পুকুরে আসবে কোত্থেকে?' তারপর চুপ করে গেল।

মামুন হঠাৎ বলে বসল, 'আমি বলব, বাবা? আমি বলব?'

ছেলেকে মুখঝামটা দিয়ে থামিয়ে দিল জপেশ্বর, 'চুপ কর! সব কথায় পোদ্দারি!'

'বলুন না, ভাই। আমি কাউকে জানাব না। যদি ভূত-প্রেত-অপদেবতার ব্যাপার থাকে তা হলে এখানে জমি কিনে বিদ্যুৎ আনিয়ে কি আমি ফেঁসে যাব!' কথা বলতে-বলতে পাঞ্জাবির পকেট থেকে দুটো একশো টাকার নোট বের করলেন। জপেশ্বরের দিকে এগিয়ে দিয়ে বললেন, 'এটা রাখুন। পুজোপরবের সময় ছেলেকে জামা-টামা কিনে দেবেন...।'

একটু কিন্তু-কিন্তু করে জপেশ্বর টাকাটা নিল। কোমরে গুঁজে রাখতে-রাখতে মিনমিনে গলায় বলল, 'কিছু তো একটা পুকুরের ভেতরে আছে, বাবু—কিন্তু কী আছে তা জানি না।'

জপেশ্বরের মুখেই পুকুরের কাহিনি শোনা গেল।

এই পুকুরটা ওদের ঘর-বাড়ি আর চাষবাসের এলাকার কিনারায় বলে জপেশ্বররা অনেকেই এটা সময়ে অসময়ে ব্যবহার করে। আগে সবাই এখানে স্নান করত, কাপড় কাচত, বাসন মাজত। কিন্তু পাঁচ বছর আগে একটা ঘটনা ঘটার পর থেকে পুকুরটা লোকে ব্যবহার করতে ভয় পায়। স্নান তো কেউ করেই না, আর কাপড় কাচা বা বাসন মাজার ব্যাপারটা চলে দড়ি-বালতি নিয়ে—যেমনটা জপেশ্বর এখন করছে।

'কী হয়েছিল পাঁচ বছর আগে?' প্রিয়নাথ জিগ্যেস করলেন।

'টাইমটা বর্ষার সময় ছিল। মাঠে ছেলেপিলের দল ফুটবল খেলছিল। তো খেলার শেষে হাত-পা ধুয়ে সাফসুতরো হওয়ার

জন্যে তিনজন জোয়ান ছেলে এই পুকুরে নেমেছিল। তখন সন্ধে হয়-হয়। তো হঠাৎ যে কীসে ওদের টেনে নিল কেউ জানে না। তিনজনই ভালো সাঁতার জানত। কিন্তু ওরা কেউ আর উঠল না।

'পুকুর ঘিরে আমরা হইচই করলাম। হ্যাজাক বাতি জ্বেলে জাল-টাল ফেললাম। কিন্তু কোনও লাভ হল না। ওরা আর উঠল না।

'আর আশ্চর্যের কথা কী বলব, বাবু—ওদের বডিও ভেসে উঠল না। ছেলে তিনটে একেবারে হাপিস হয়ে গেল। অথচ এ-পুকুরে চানা-চুনো মাছ ছাড়া মাছ নেই। হাঙর-কামট তো দূরের কথা! তো তখন থেকে এটা ভূতুড়ে পুকুর হয়ে গেল। কেউ এ পুকুরে নামে না।'

'কখনও জাল-টাল ফেলে এখান থেকে কিছু পাওয়া যায়নি?'

'না, না—কিছুই পাওয়া যায়নি।' পুকুরের দিকে কিছুক্ষণ তাকিয়ে রইল জপেশ্বর। আনমনাভাবে দুবার কান চুলকে নিয়ে বলল, 'আরও একটা ব্যাপার এই পুকুরে হয়, বাবু—।'

'কী হয়?'

'মাঝে-মাঝে এর জল নড়ে ওঠে...দুলতে থাকে। ভূমিকম্পের সময় যেমনটি হয়...।'

'সে কী!' অবাক হয়ে গেলেন ভূতনাথ ঃ 'এরকম নড়ে ওঠে কেন?'

'জানি না, বাবু। বোধহয় জাগ্রত কোনও অপদেবতা এই কাণ্ডটি ঘটান...।'

কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে পুকুরের ওপারের দিকে আঙুল দেখাল জপেশ্বর ঃ 'ওই যে লম্বামতন লোকটা—-ও-ই এসব পুকুর, মন্দির আর জমিনের মালিক। ওর নাম পত্রলোচন। সবসময় বলে বেড়ায়, ও নাকি এই এলাকার জমিদার। হুঁঃ, জমিদার না ঘেঁচু। আমরা কি আর বুঝি না! সে তুমি যা-ই হও, আমাদের জমিজমা, চাষবাস আর পুকুরে হাত লাগাতে এসো না। তারপর জমিদার হও, কি মহারাজা হও, কি সুলতান হও—আমাদের জানার দরকার নেই...।'

মামুন অনেকক্ষণ ধরে চুপচাপ ছিল। বাবা একাই যে প্রিয়নাথের সব মনোযোগ টেনে নিচ্ছে এটা ওর পছন্দ হচ্ছিল না। তাই ও আঙুল দেখিয়ে ফস করে ফোড়ন কাটল, 'ওসব জমি কিনবেন না, বাবু—সব ভূতুড়ে জমি...।'

'তুই চুপ কর!' ছেলেকে ধাতানি দিল জপেশ্বর, 'সব ব্যাপারে বকবক-বকবক।' তারপর প্রিয়নাথের দিকে ফিরে বলল, 'পত্রলোচন সুবিধের লোক না, বাবু। শুনেছি ওর বউ আর ছেলে দিন-রাত চোখে কালো চশমা লাগিয়ে রাখে। এ আবার কোন দেশি নকশা!

'যদি এই গরিবের কথা শোনেন, বাবু, এখানে জমিন কিনবেন না। অন্য কোথাও জমিন কিনে আপনার কোল্ড এস্টোরেজ না কী বললেন—ওইসব বানান। পত্রলোচনের জমিনে গণ্ডগোল আছে...!'

'কীসের গণ্ডগোল?' প্রিয়নাথ জানতে চাইলেন।

'ওঁর জমিন থেকে কত লোক উধাও হয়ে গেছে জানেন? লাস্ট

সাত বছরে কমপক্ষে বারো-তেরোজন! এ ছাড়া হাঁস-মুরগি, গোরু-ছাগল তো আছেই! ফাঁকা জমির ওপর দিয়ে হেঁটে যেতে-যেতে হঠাৎ আর নেই। সব উধাও! তো এরকম বেশ ক'বার হওয়ার পর খুব দরকার না হলে ওই ভূতুড়ে জমিনের ওপর দিয়ে আমরা কেউ হেঁটে যাই না। ওর জমিনের ওপর দিয়ে গেলে অনেকটা রাস্তা কম হয়। কিন্তু কে বিপদ ঘাড়ে নেবে বলুন! তাই আমরা সব ঘুরপথে যাতায়াত ক'রি...।' একটু দম নিল জপেশ্বর। তারপর বলল, 'সন্ধের মুখে এখানকার মাঠেঘাটে ছুটন্ত ছায়া দেখা যায়। দৌড়োচ্ছে। খাড়া হয়ে নয়—মাঠের সঙ্গে লেপটে গিয়ে। যেন মাঠের ওপরে আঁকা কালো-কালো ছায়া। চারদিকে এলোমেলো ছুটছে। এসব কথা শুনলেই তো বুকটা ধড়ফড় করে। ওফ্, সে আর বুকের কী দোষ।'

চপলকেতুর চপল ছায়া। মনে-মনে ভাবলেন প্রিয়নাথ। এরই একটা ছোট সংস্করণ তা হলে কাল রাতে পত্রলোচনের ঘরের দেওয়ালে ওঁরা দেখেছেন!

'উধাও হয়ে যাওয়া মানুষগুলোর আর কোনও খোঁজ পাওয়া যায়নি?'

'না। একেবারে হাওয়ায় মিশে গেছে।'

'মানুষগুলো সাধারণত কোন সময়ে উধাও হয়েছে?'

'দিনেরবেলা। কখনও দুপুরে, কখনও বিকেল আর সন্ধের মুখোমুখি—।'

'পত্রলোচনবাবু এ নিয়ে কাউকে কিছু বলেননি?'

'ওঃ, পত্রলোচনবাবু!' ব্যঙ্গ করে ঠোঁট বেঁকাল জপেশ্বর ঃ 'ওই

লম্বু পত্রলোচনটা মহা সেয়ানা। আর হাড়ে বজ্জাত। খেয়েদেয়ে কোনও কাজ নেই, একগাদা ভূতুড়ে জমিন আর পুকুর-টুকুর নিয়ে আমাদের অঞ্চলে থেবড়ে বসে আছে! যা-ই হোক, বাবু, ওর জমিন আপনি না কিনলেই ভালো...। ছোট মুখে এর বেশি আর কী বলব!'

জপেশ্বর চুপ করে গেল। মাথা তুলে একবার সূর্যের দিকে তাকাল। বোধহয় সময় আঁচ করতে চাইল।

প্রিয়নাথ ওকে ধন্যবাদ জানিয়ে ফেরার পথ ধরলেন। ওপারে তাকিয়ে দেখলেন, রোদের হাত থেকে বাঁচতে মিংকিরা সবাই গাড়ির ভেতরে গিয়ে বসেছে। শুধু পত্রলোচন টাটা সুমোর বাইরে একা দাঁড়িয়ে রয়েছেন। হয়তো প্রিয়নাথের ফিরে আসার জন্য তিনি কিছুটা উদগ্রীব। ওই গ্রাম্য লোকটির সঙ্গে প্রিয়নাথের কী-কী কথাবার্তা হল সেটা জানার কৌতূহলও হয়তো পত্রলোচনের কম নয়।

পুকুরের জল নড়ার কথাটা ভাবছিলেন ভূতনাথ। ভূমিকম্প ছাড়া জলের এরকম দুলুনি খুবই অস্বাভাবিক। একমাত্র জলের গভীরে থেকে কেউ যদি জলে হাত-পা নেড়ে কিংবা বইঠাজাতীয় কিছু দিয়ে আলোড়ন তোলে তবেই জলের ওপরের তল এপাশ-ওপাশ দুলতে পারে।

কিন্তু জলের গভীরে থেকে এরকম ডিস্‌টারব্যান্স তৈরি করবে কে?

প্রিয়নাথের ছুটন্ত পায়ের শব্দের কথা মনে পড়ল। ওই পায়ের মালিকরা ওরকম ব্যস্তভাবে ছুটোছুটি করছে কেন? ওরা কি

দৌড়ে পালাচ্ছে?

কিন্তু কার কাছ থেকে পালাচ্ছে? কোথায় পালাচ্ছে? পত্রলোচন কি এ ব্যাপারে কিছুই জানেন না? সবসময় তিনি যেরকম ভাবলেশহীন নির্বিকার অভিব্যক্তি নিয়ে পাথরের মূর্তির মতো নিথর হয়ে আছেন, সেটাই কি ওঁর আসল চেহারা? নাকি ওটা মুখোশ?

পায়ে-পায়ে পত্রলোচনের কাছে চলে এসেছিলেন প্রিয়নাথ।

'কী, জোয়ারদারবাবু, কথাবার্তা বলে কিছু লাভ হল?'

প্রিয়নাথ ঠোঁট উলটে বললেন, 'কথাবার্তা তো বললাম, কিন্তু তাতে লাভ হল না ক্ষতি হল সেটাই ঠিকমতো বুঝতে পারছি না...।'

পত্রলোচনের মুখের দিকে খুঁটিয়ে দেখলেন প্রিয়নাথ। পকেট থেকে উইল্‌স ফিলটারের প্যাকেট বের করে একটা সিগারেট ধরালেন।

পত্রলোচনকে সিগারেট অফার করতে তিনি সবিনয়ে বললেন যে, বিড়ি ছাড়া অন্য কিছু ওঁর সয় না।

লম্বা মানুষটার দিকে তাকিয়ে ভূতনাথের মনে পড়ছিল, একটু আগেই জপেশ্বর একে বলেছে 'মহা সেয়ানা' আর 'হাড়ে বজ্জাত'। কিন্তু কেন বলল, তার কারণটা খুঁজে পাচ্ছিলেন না।

প্রিয়নাথ গাড়ির কাছে এসে দাঁড়াতেই রমাশঙ্কর গাড়ি থেকে নেমে পড়েছিলেন।

প্রিয়নাথ ওঁকে বললেন, 'ওই লোকাল লোকটির সঙ্গে এমনি একটু কথাবার্তা বলছিলাম। আপনি ইচ্ছা করলে গিয়ে কথা বলে

আসতে পারেন—আমরা ওয়েট করছি...।'

রমাশঙ্কর দত্ত ফোঁস করে একটা শ্বাস ফেললেন। একটু গম্ভীর গলায় বললেন, 'নাঃ, ভেবে দেখলাম তার কোনও দরকার নেই। দরকার হয় তো পরে বলব, এখনও পর্যন্ত তো সেরকম আনন্যাচারাল কোনও ফেনোমেনন দেখতে পাইনি! সেরকম কিছু দেখতে পেলেই ইনভেস্টিগেশান শুরু করে দেব...।'

প্রিয়নাথ আলতো গলায় শুধু বললেন, 'ভালো।'

মিংকি গাড়ির ভেতর থেকে গলা বাড়িয়ে জিগ্যেস করল, 'ভূতনাথদা, এবার কোন স্পটে যাবেন?'

'চলো, গাড়িতে তো আগে উঠি। তারপর ডিসাইড করব।' সিগারেটে একটা জোরালো টান দিয়ে টাটা সুমোয় উঠে বসলেন।

পত্রলোচন চটপট বিজয় রাধের পাশে বসে পড়লেন।

গাড়ি স্টার্ট দিতেই তৃষ্ণা একটা পলিথিনের ক্যারিব্যাগের মুখ খুলে ফেলল। তারপর তার ভেতর থেকে চারটে প্যাকেট-ব্রেকফাস্ট বের করল। তারই একটা ভূতনাথের দিকে এগিয়ে দিয়ে বলল, 'দাদা, আমাদের ব্রেকফাস্ট। চিকেন স্যান্ডউইচ, ফ্রেঞ্চ ফ্রাই আর ডিমসেদ্ধ। চটপট খেয়ে নিন—বেশ বেলা হয়ে গেছে।'

প্রিয়নাথ প্যাকেটটা নিলেন। সিগারেটটা গাড়ির জানলা দিয়ে ফেলে দিলেন। তারপর ব্রেকফাস্টের প্যাকেটটা খুলতে-খুলতে বললেন, 'ঠিক বলেছ, তৃষ্ণা—আই অ্যাম হাংরি...।'

বাকি তিনটে প্যাকেট মিংকি, রমাশঙ্কর আর পত্রলোচনের কাছে হাতে-হাতে পৌঁছে গেল।

প্রিয়নাথ স্যান্ডউইচে কামড় বসানোর আগে তৃষ্ণাকে জিগ্যেস করলেন, 'তোমরা ঠিকমতো খেয়েছ তো?'

তৃষ্ণা জোর গলায় বলল, 'অফ কোর্স!'

আট

পত্রলোচনের উপদ্রুত এলাকা ঘুরে সবকিছুই দেখা হল। তিনটে পুকুর, তিনটে প্রাচীন বাড়ি, দুটো পুরোনো মন্দির, আর সবার শেষে নাটমঞ্চ এবং তার লাগোয়া চণ্ডীমণ্ডপ।

দেখে প্রিয়নাথের মনে হল, বাড়ি, মন্দির, নাটমঞ্চ সবই কয়েকশো বছরের প্রাচীন। পত্রলোচনকে জিগ্যেস করে জানা গেল ব্যাপারটা ঠিক তাই। ওঁর ঠাকুরদার ঠাকুরদা, এবং তাঁরও ঠাকুরদা এইসব বাড়ি আর মন্দির তৈরি করেছিলেন। তখন এই চপলকেতুতে পত্রলোচনের বংশের বহু মানুষ বাস করত। বলতে গেলে এই বিশাল মাপের গ্রামটা শুধু সিংহ রায় পরিবারের লোকজনেই গমগম করত।

তখন চণ্ডীমণ্ডপে প্রতিমা ছিল। রোজ পুজোর ব্যবস্থা ছিল। ধূপধুনো দিয়ে সন্ধ্যারতি হত, ঢাক বাজত, কাঁসরঘণ্টা বাজত।

প্রত্যেক বাংলা মাসের শেষ শনিবার খুব ধুমধাম করে পুজো হত। গ্রামের সবাই জড়ো হত এই চণ্ডীমণ্ডপে। পুজোর পরে নাচ-গানের আসর বসত নাটমঞ্চে।

সেসব একটা দিন ছিল বটে!

নাটমঞ্চের সামনে দাঁড়িয়ে পুরোনো সেইসব দিনের কথা বলছিলেন পত্রলোচন। বাকিরা মনোযোগ দিয়ে ওঁর কথা শুনছিল। যেন কোনও জায়গায় বেড়াতে এসে গাইডের কাছ থেকে সে-জায়গার ইতিহাস শুনছিল সবাই।

নাটমঞ্চ আর চণ্ডীমণ্ডপের একইরকম দুরবস্থা। ক্ষয়ে যাওয়া ভাঙাচোরা পাতলা ইটের কাঠামো। সব জায়গা থেকে প্রেতিনীর চুলের মতো ঝুলে আছে বটগাছের ঝুরি। অসংখ্য পায়রা, চামচিকে আর বাদুড় বাসা বেঁধেছে সেখানে।

মণ্ডপের চারদিকে ইটের পিলার, তার বহু জায়গা ক্ষয়ে গেছে। মাথার ছাদও তেমন—কোথাও আছে, কোথাও নেই। জায়গায়-জায়গায় কড়িবরগার কঙ্কাল বেরিয়ে পড়েছে।

চণ্ডীমণ্ডপের প্রতিমার মূর্তি কালো পাথরের তৈরি। আভরণ বলতে কিছুই আর অবশিষ্ট নেই। মুকুটের একটা দিক ভাঙা। একটা চোখের গর্ত ভেঙে বড় হয়ে গেছে। বাঁ-হাতটা কনুই থেকে ভেঙে পড়েছে। দেবীমূর্তির সারা গায়ে সাদা-সাদা আঁচড়ের দাগ। পায়ের কাছে জড়ো হয়ে আছে ছোট-বড় ইট-পাথরের টুকরোর স্তূপ। স্তূপ না বলে সেটাকে ধ্বংসস্তূপ বলাটাই বোধহয় ভালো।

পত্রলোচন ভক্তিভরে প্রতিমাকে প্রণাম করলেন। প্রিয়নাথ, মিংকি, তৃষ্ণাও। রমাশঙ্কর চারপাশটা ঘুরে-ঘুরে দেখছিলেন। হয়তো কোনও লুকোনো ফাঁকফোকর খুঁজছিলেন। বিনোদকুমারের কানে ইয়ারফোন গোঁজা। সেই অবস্থাতেই ও নানান অ্যাঙ্গেল থেকে দেবী ও মন্দিরের ছবি তুলছিল।

মিংকির দেওয়া ডিভিডিতে ভূতনাথ চণ্ডীমণ্ডপ বা নাটমঞ্চের

ছবি দেখেছেন। ফলে বারবারই ওঁর মনে হচ্ছিল, একই জায়গায় যেন দ্বিতীয়বার বেড়াতে এসেছেন।

রাতে এই নাটমঞ্চ থেকে নাকি গানবাজনার শব্দ ভেসে আসে। এর কাছাকাছি অঞ্চল থেকে দু-বছর আগে একজন মানুষ উধাও হয়ে গেছে। তার আর কোনও খোঁজ পাওয়া যায়নি।

প্রিয়নাথ কাঁধের ঝোলা ব্যাগ থেকে চপলকেতুর ম্যাপটা বের করলেন। সেটা খুলে খুঁটিয়ে দেখতে লাগলেন।

কিছুক্ষণ পর ম্যাপটা ব্যাগে ঢুকিয়ে একটা প্যাড বের করলেন। মিংকির দেওয়া ডিভিডিতে চপলকেতুর এপিসোডটা দেখার সময় এই প্যাডের পাতায় প্রচুর নোট্‌স নিয়েছিলেন। এখন প্যাডের নানান পৃষ্ঠা উলটেপালটে সেইসব নোট্‌স খতিয়ে দেখছিলেন।

মিংকি একটু দূরে একটা পিলারের পাশে দাঁড়িয়ে মোবাইল ফোনের বোতাম টিপে কারও নম্বর লাগাতে চেষ্টা করছিল। কিন্তু বারবার চেষ্টা করেও কানেকশান না পাওয়ায় 'শিট', 'শিট' বলছিল।

সময় গড়াতে-গড়াতে বেলা চড়ে গেছে। যেদিকে তাকানো যায় সেদিকেই গনগনে রোদ। চণ্ডীমণ্ডপ আর নাটমঞ্চ ঘিরে বেশ কয়েকটা বড়-বড় গাছ। কিন্তু সেগুলো পেরিয়ে দৃষ্টি মেললেই সবুজহীন ছড়ানো ধু-ধু প্রান্তর। একগাছা ঘাসও নেই—শুধু ধুলো-মাটির মাঠ।

চপলকেতুর 'ভূতুড়ে' এলাকার বেশিরভাগ জায়গাই এইরকম। যেন এ-অঞ্চলের সবুজ ধীরে-ধীরে ক্ষয়ে যাচ্ছে। পুরোপুরি নিশ্চিহ্ন হয়ে যাওয়ার আগে প্রিয়নাথরা এখানে এসে পড়েছেন। তাই

কোথাও-কোথাও দু-চার গন্ডা গাছপালা দেখে ফেলেছেন।

প্রিয়নাথ পত্রলোচনের কাছে এলেন। নীচু গলায় জিগ্যেস করলেন, 'এখানে গাছপালার ব্যাপারটা এত কম কেন?'

'জানি না। সেই ছোটবেলা থেকে দেখছি, ক্রমশ সব গাছগাছড়া কমে যাচ্ছে। এভাবে সবুজ কে খেয়ে নিচ্ছে কে জানে!'

'একটা কথা আপনাকে জিগ্যেস করব?'

পত্রলোচন নির্বিকার মুখে বললেন, 'বলুন—।'

'উধাও হয়ে যাওয়া মানুষগুলো কোথায় যায় বলে আপনার মনে হয়?'

এরকম সরাসরি প্রশ্নে পত্রলোচন কেমন যেন ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে গেলেন। ওঁর নির্বিকারভাবের মুখোশটা যেন একপলকের জন্য সরে গেল। তারপরই নিজেকে সামলে নিয়ে ঠোঁট উলটে হাত ঘুরিয়ে বললেন, 'আমি কী করে জানব!'

প্রিয়নাথ আড়চোখে লক্ষ করলেন, মিংকি ফোনে লাইন পেয়ে গেছে। ইংরেজি আর হিন্দিতে কারও সঙ্গে কথা বলছে। দু-একটা কথার টুকরো শুনে মনে হল, ওর চ্যানেলের ডিরেক্টর।

পত্রলোচনের দিকে ফিরে তাকালেন প্রিয়নাথ ঃ 'না, মানে...উধাও হওয়ার ব্যাপারে আমি আপনার আইডিয়া জানতে চাইছি...।'

'আমার কোনও আইডিয়া নেই। হয়তো দেবতা ওদের টেনে নিয়েছে...।'

'দেবতা নয়—অপদেবতা।'

এই মন্তব্যে পত্রলোচন কেমন যেন গুম হয়ে গেলেন। নিজেকে গুটিয়ে নিলেন পলকে।

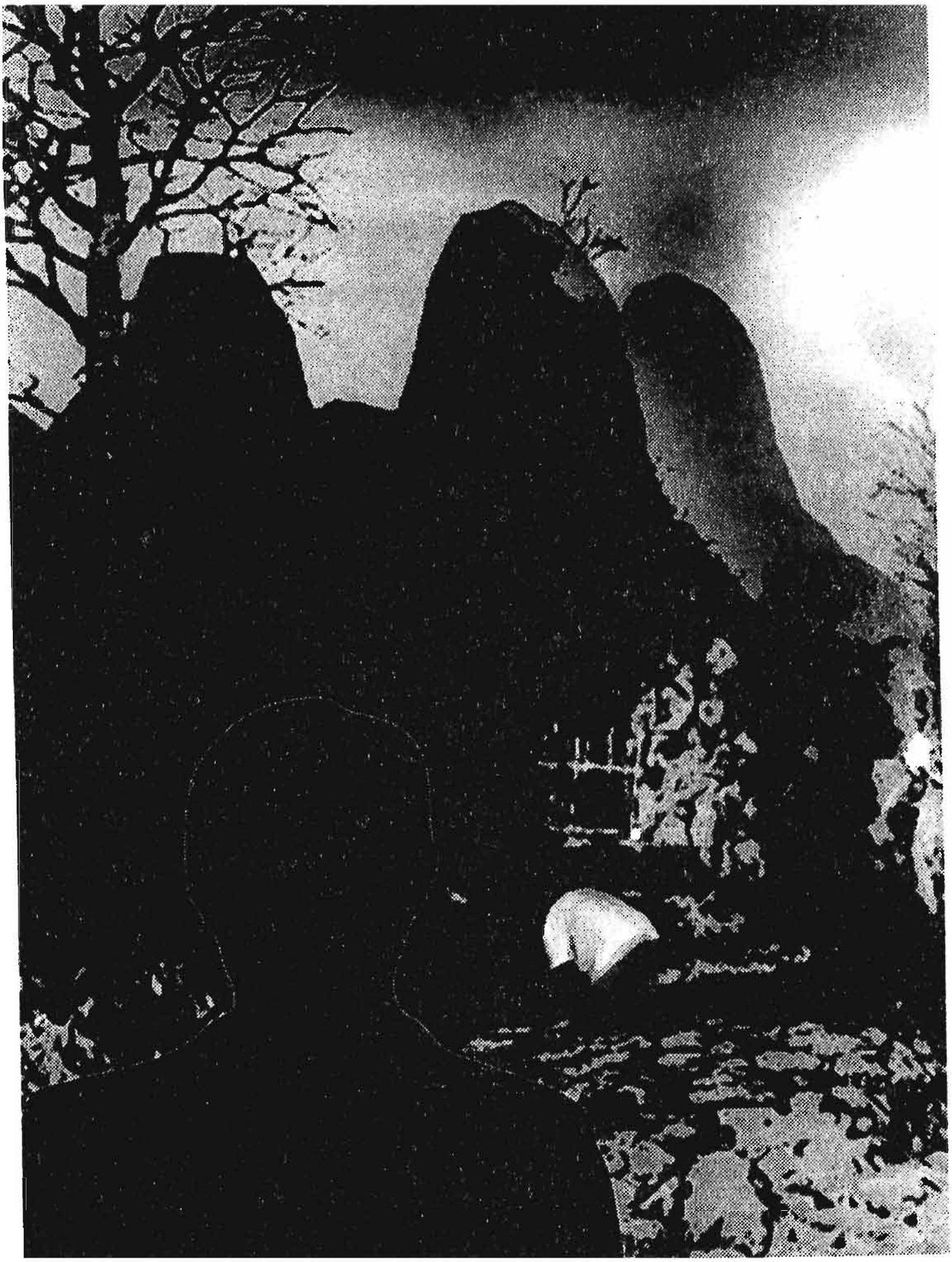

প্রিয়নাথ ওঁর কাছ থেকে সরে এলেন। মিংকি কথা শেষ করে প্রিয়নাথের কাছে এসে দাঁড়াল।

'কী ব্যাপার? ডিরেক্টর কী বলছে?'

'কী আর বলবেন! সেই এক কথা ঃ প্রুফ মিলা কি নহি?'

'ধৈর্য, মিংকি, ধৈর্য। ধৈর্য ধরতে হবে।'

মিংকি তখন চাপা গলায় বলল, 'ভূতনাথদা, আমার মন বলছে কি ওই সিন্‌হা রায় অনেক কিছু জানেন—।'

'অনেক কিছু নয়, উনি সব জানেন। মুখে কুলুপ এঁটে রয়েছেন।'

'কুলুপ মানে?'

'হি ইজ কিপিং হিজ মাউথ শাট।'

'ও। কিন্তু তাতে ওঁর কী বেনিফিট?'

'সেটা এখনও বুঝতে পারছি না...।'

রমাশঙ্কর দত্ত কখন যেন প্রিয়নাথদের কাছে চলে এসেছেন। তিনি মিংকিকে লক্ষ করে বললেন, 'মিস তেওয়ারি, কিছু মাইন্ড করবেন না। আমি কিন্তু এখনও পর্যন্ত সুপারন্যাচারাল ব্যাপারের কোনও কংক্রিট প্রুফ পাইনি। নিজের চোখে না দেখলে, নিজে এক্সপিরিয়েন্স না করলে—সে-ব্যাপারটাকে জেনুইন, অথেনটিক বলে অ্যাক্‌সেপ্ট করা মুশকিল। আপনি, মিস্টার জোয়ারদার—আপনারা নিশ্চয়ই প্রুফ জোগাড় করার ব্যাপারে আমাকে হেল্‌প করবেন। কারণ, তা হলে আপনার ওই প্রোগ্রাম "তেনারা যেখানে আছেন" নিশ্চিন্তে রেগুলার টেলিকাস্ট করা যাবে, তাই না?'

মিংকি ভুরু কুঁচকে রমাশঙ্করের দিকে তাকাল ঃ 'হঠাৎ এ-কথা

বলছেন!'

'না, মানে, তখন থেকে দেখছি, মিস্টার জোয়ারদার এর-ওর সঙ্গে একা-একা ফুসুরফুসুর করছেন। নানান খোঁজখবর করছেন। অথচ আমাকে কিছু জানাচ্ছেন না। সেইজন্যেই এ-কথা বললাম...।'

প্রিয়নাথ রমাশঙ্কর দত্তের কাছে এগিয়ে এলেন।

মিংকি প্রিয়নাথকে লক্ষ করছিল। ও ভেবেছিল, রমাশঙ্করের কথায় প্রিয়নাথ বোধহয় রেগে যাবেন। কিন্তু সেটা হল না। ও দেখল প্রিয়নাথের ঠোঁটে বরং একচিলতে হাসি।

'মিস্টার দত্ত, আপনি শুরু থেকেই বলে আসছেন, আপনি কংক্রিট প্রুফ চান। প্রুফ ছাড়া আপনি কিছু বুঝতে চান না। আমি যার সঙ্গে যত খুশি ফুসুরফুসুর করি না কেন তাতে তো আর কংক্রিট প্রুফ জেনারেট করা যায় না! সেইজন্যেই ওসব গালগল্প শুনিয়ে আপনাকে বিরক্ত করতে চাইনি।

'আপনি বলছেন, নিজের চোখে দেখলে কিংবা নিজে এক্সপিরিয়েন্স করলে তবেই আপনি কোনও ঘটনাকে অথেনটিক বলে অ্যাক্সেপ্ট করবেন। তা হলে গতকাল রাতে পত্রলোচনবাবুর ঘরের দেওয়ালে ওই ছায়ার ঘটনাটা কী? ওটা আপনি অথেনটিক বলে অ্যাক্সেপ্ট করতে পারছেন না কেন?'

কথা বলতে-বলতে প্রিয়নাথ কিছুটা উত্তেজিত হয়ে পড়েছিলেন।

রমাশঙ্কর চুপ করে রইলেন—কোনও জবাব দিলেন না।

পত্রলোচন সব কথাবার্তা শুনলেও বরাবরের মতোই ভাবলেশহীন, নির্বিকার।

প্রিয়নাথ একটা বড় শ্বাস ফেলে বললেন, 'আপনি বরং

আপনার মতো করে বুজরুকির প্রমাণ খুঁজুন, আমি আমার মতো। আমরা দুজনে ইনডিপেন্ডেন্ট্‌লি কাজ করলে সেটা দুজনের পক্ষেই বেটার, তাই না?'

রমাশঙ্কর এখনও চুপ।

মিংকি প্রিয়নাথকে হাত ধরে একপাশে টেনে নিয়ে গিয়ে বলল, 'ভূতনাথদা, কিছু পেলেন?'

'না, মিংকি—এখনও সিরিয়াস কোনও প্রুফ পাইনি। আমি শুধু ভাবছি, মানুষগুলো লোপাট হয়ে তারপর যাচ্ছে কোথায়!'

জপেশ্বরের কাছে শোনা কথাগুলো নীচু গলায় মিংকিকে বললেন। বলতে-বলতে প্রিয়নাথের কপালে চিন্তার ভাঁজ পড়ল।

প্রথম পুকুরটা ছাড়া আরও যে-তিনটে পুকুর পত্রলোচনের এলাকায় আছে সেগুলো দেখামাত্রই প্রিয়নাথ বুঝেছেন সেগুলো বহুবছর ব্যবহার করা হয় না। ঘাস, পাতা, আবর্জনায় পুকুরগুলো একেবারে শেষ। তিনটে পুকুরের মধ্যে যেটা সবচেয়ে বড় সেটারই নাম 'চানপুকুর'। তার প্রায় গা ঘেঁষে একটা মন্দির। এককালে লোকে এখানে স্নান-টান সেরে মন্দিরে পুজো দিত। মন্দিরটা এতটাই ভাঙাচোরা যে, বিগ্রহ বলে কিছু চেনা যায় না। শুধুই ধ্বংসস্তূপ। একদিকের দেওয়াল ভেঙে পড়েছে। ছাদও প্রায় অর্ধেকটা ভাঙা। সেই ফাঁক দিয়ে গাছের পাতা আর আকাশ উঁকি মারছে।

অন্য মন্দিরটা আর পত্রলোচনের বাকি তিনটে বাড়িও খুঁটিয়ে দেখেছেন ভূতনাথ। ওরা যে ভীষণ পুরোনো এবং জরাজীর্ণ এ ছাড়া ওদের আর কোনও বৈশিষ্ট্য নেই। না, বাড়িগুলোর ভেতরে

প্রিয়নাথ ঢোকেননি। কারণ, ভূত-প্রেত নিশ্চয়ই প্রিয়নাথের অপেক্ষায় ভেতরে এখন বসে নেই! তা ছাড়া বাইরেটা দেখেই ভেতরের অবস্থা বোঝা যাচ্ছে।

মিংকিদের ডিভিডিতে এগুলোর চেহারা বেশ ডিটেলে দেখানো হয়েছে—তবে সবটাই বাইরে থেকে। আর এই বাড়ি তিনটে, দুটো মন্দির, এগুলো যে 'হন্টেড' সেরকম কথা ওদের এপিসোডে বলা হয়নি।

প্রিয়নাথের কপাল থেকে চিন্তার ভাঁজগুলো যাচ্ছিল না। ওঁর বারবার মনে হচ্ছিল, চপলকেতুর ভৌতিক ক্রিয়াকলাপ নিয়ে পত্রলোচনের বিন্দুমাত্রও মাথাব্যথা নেই। দিব্যি আছেন। যারা এই এলাকার আশপাশের পড়শি তারাও যেন ব্যাপারটার সঙ্গে নিজেদের রোজকার জীবন মানিয়ে নিয়েছে। অর্থাৎ, এখানকার ভূতুড়ে ব্যাপারস্যাপার নিয়ে কারও কোনও অনুযোগ-অভিযোগ নেই। সবকিছুই নিজের নিয়মে চলছিল।

কিন্তু হঠাৎই গোলমাল বাধাল মিংকি তেওয়ারিদের 'রেনবো' চ্যানেল। ওদের লোকজন এসে শান্ত ঘুমন্ত এলাকাটাকে খোঁচাখুঁচি শুরু করল। এখন কী হয় কে জানে! কোথাকার জল কোথায় গিয়ে দাঁড়াবে সেটা বলা মুশকিল। কারণ, ভূতনাথ নিজের অভিজ্ঞতা থেকে জানেন, উপদ্রুত এলাকা যখন শান্ত থাকে তখন তাকে ডিসটার্ব করলে উপদ্রব বাড়ে। 'ঘুমন্ত' টিউমারকে ছুরি-কাঁচি দিয়ে ডিসটার্ব করলে যেমন সমস্যা বেড়ে যায়।

গতকাল রাতে দেখা ছুটন্ত ছায়ার কথাও ভাবছিলেন। সেটা যে চপলকেতুর 'হন্টিং'-এর একটা নমুনা তা নিয়ে প্রিয়নাথের মনে

কোনও সন্দেহ নেই। মিংকিদের এপিসোডে এইরকম ছুটন্ত ছায়ার কথা বলা আছে। সন্ধের মুখে বেশ কয়েকবার দেখা গেছে। খোলা মাঠে। লোকাল লোকজনরা দেখেছে। এই ছুটন্ত ছায়ার কথাই জপেশ্বর মালিক বলছিল।

এমন সময় গাড়িতে ওঠার ডাক পড়ল। লাঞ্চের সময় অনেকক্ষণ পেরিয়ে গেছে। লাঞ্চ সেরে এসে আবার ঘোরাঘুরি করা যাবে।

পত্রলোচনকে ওঁর বাড়ির সামনে নামিয়ে দিয়ে টাটা সুমো পাকা রাস্তার দিকে ছুটল। প্রিয়নাথ ব্যাগ থেকে একটা ছোট বাইনোকুলার বের করে চোখে দিলেন। ছুটন্ত গাড়ির জানলা দিয়ে তিনি খোলা প্রান্তরের দিকে দেখছিলেন।

বহু দূরে তিনি দুজন মানুষকে দেখতে পেলেন। দুজনের চেহারাই কালো, রোগা। একজন লম্বা, একজন বেঁটে। একজনের গায়ে সাদাটে হাফশার্ট, আর-একজনের গায়ে গামছা ছড়ানো। ওরা খোলা মাঠের ওপর দিয়ে হেঁটে যাচ্ছে। রাস্তা শর্টকাট করছে।

খোলা মাঠ থেকে কেমন করে উধাও হয়ে যায় মানুষ? গোরু-ছাগল? কোথায় যায়? চোখের সামনে এইরকম উধাও হওয়ার ঘটনা ঘটলে প্রিয়নাথ কি সে-রহস্য ভেদ করতে পারতেন?

যতক্ষণ দেখা যায়, দূরবিন তাক করে লোক দুটোকে দেখতেই থাকলেন প্রিয়নাথ।

*

লাঞ্চ সেরে ফিরে আসার পর সকলেরই এনার্জি বেশ কমে গেছে বলে মনে হল। বিনোদকুমার তো গাড়িতে ঘুমিয়েই পড়ল।

দেখে মনে হচ্ছিল, কানে ইয়ার প্লাগ গুঁজে ও চোখ বুজে মনোযোগ দিয়ে গান শুনছে। কিন্তু তৃষ্ণা কী কারণে ওকে দুবার ডাকতেই ঘুমের ব্যাপারটা ধরা পড়ে গেল। ও চমকে জেগে উঠে বেশ লজ্জা পাওয়া চোখে এর-ওর দিকে তাকাল। মিনমিনে গলায় বলল যে, পেট ভরে খাওয়ার পর ওর চোখ লেগে গিয়েছিল।

রমাশঙ্কর একটু বেশিরকম চুপচাপ হয়ে গিয়েছিলেন। শুধু একবার প্রিয়নাথকে বললেন যে, তিনি পত্রলোচনের ঘরের দেওয়ালটা আরও একবার ভালো করে পরীক্ষা করতে চান। প্রিয়নাথ কি তখন ওঁর সঙ্গে থাকতে চান?

প্রিয়নাথ তখন সিগারেটে টান দিতে ব্যস্ত। রমাশঙ্করের দিকে তাকিয়ে মাথা নেড়ে জানালেন, না তিনি থাকতে চান না।

রমাশঙ্কর তখন পকেট থেকে মোবাইল ফোন বের করে বোতাম টিপতে শুরু করলেন। কয়েকবার চেষ্টা করে বিরক্ত হয়ে বললেন, 'কী যে আন্ডারডেভেলাপ্‌ড জায়গা! একটুও টাওয়ার পাচ্ছি না—।'

কেউ কোনও কথা বলল না।

মিংকি ঘুমের টানে বারবারই প্রিয়নাথের গায়ে ঢলে পড়ছিল। প্রিয়নাথ শুধু খেয়াল রাখছিলেন, ওর মাথাটা কোথাও যেন ঠুকে না যায়।

পত্রলোচনের বাড়ির কাছে এসে বিজয় রাধে গাড়িটাকে বাড়ির পাশ দিয়ে নিয়ে গেল পিছনদিকে। প্রিয়নাথ, মিংকি আর রমাশঙ্কর নেমে পড়লেন গাড়ি থেকে। বিজয়ও গাড়ি থেকে নেমে পড়ল। তারপর বড়-বড় দুটো ভারী পলিব্যাগ নিয়ে রেখে দিল প্রিয়নাথদের

ঘরের দরজায়।

একটা পলিব্যাগে রয়েছে ছ'টা এক লিটারের জলের বোতল, বেশ কয়েকটা মোমবাতি আর দেশলাইয়ের বাক্স। আর অন্য পলিব্যাগটায় স্লাইস কেক আর বিস্কুটের তিনটে করে প্যাকেট।

বিনোদকুমার আর তৃষ্ণা গাড়ি থেকে নামেনি। বলল, ভীষণ এগ্‌জস্টেড লাগছে। প্রিয়নাথ আর মিংকিকে সাবধানে থাকার পরামর্শ দিয়ে ওরা 'টা-টা' করে বিদায় নিল।

ওরা চলে যাওয়ার পর প্রিয়নাথরা যার-যার রসদ ভাগ করে নিয়ে নিজের-নিজের ঘরে ঢোকালেন।

রমাশঙ্কর বহুবার বোতাম টিপে-টিপে চেষ্টা করে হঠাৎই টাওয়ার পেয়ে গেছেন। তাই মোবাইল ফোন কানে লাগিয়ে চেঁচিয়ে-চেঁচিয়ে ওঁর সোসাইটির কারও সঙ্গে বোধহয় কথা বলছিলেন। সেটা দেখে মিংকি 'ভূতনাথদা, টাওয়ার আছে' বলে একেবারে লাফিয়ে উঠল। জিন্‌সের পকেট থেকে মোবাইল বের করে বোতাম টিপতে শুরু করল।

প্রিয়নাথ আবছা হাসলেন। সকালে মিংকি বেচারা অনেক চেষ্টা করেও মা-কে ফোন করতে পারেনি। টাওয়ারের সিগন্যাল ছিল না।

সে নিয়ে ও অনেকবার ভূতনাথের কানের কাছে ঘ্যানঘ্যান করেছে। তখন তিনি মজা করে বলেছেন, 'ভূতেরা ওদের গোস্ট সিগন্যাল দিয়ে মোবাইল টাওয়ারের সব সিগন্যাল জ্যাম করে দিয়েছে...।'

ঠাট্টা করে বললেও ব্যাপারটা যে অনেক সময় সত্যি-সত্যি

হয়ে যায় সেটা ভূতনাথ ভালো করেই জানেন। দেখা গেল, মিংকি এখনও টাওয়ার পেল না।

'দেখছ তো, মোবাইল ফোনের টাওয়ারের ইর‍্যাটিক ব্যাপারটা এক-এক জনের জন্যে এক-একরকম...।'

'হুঁ, তাই তো দেখছি।'

মিংকি মুখ গোমরা করে ওর ঘরের দিকে চলে গেল।

প্রিয়নাথও নিজের ঘরের দিকে হাঁটা দিলেন।

একটু পরে হাত-মুখ ধুয়ে ফ্রেশ হয়ে প্রিয়নাথ আবার ঘরের বাইরে এসে দাঁড়ালেন। আকাশের দিকে একবার তাকালেন। সেখানে ছেঁড়া-ছেঁড়া মেঘ। কোথাও ছাই রঙা, কোথাও সাদা। তারই ফাঁকে-ফাঁকে শরতের নীল।

হাতঘড়ির দিকে তাকালেন। চারটে কুড়ি। দুপুরের কড়া রোদে যে-মাঠ আর গাছপালাকে অনেক রুক্ষ কঠিন দেখাচ্ছিল, এখন তুলনায় অনেক কোমল।

শেষ বিকেলে যেসব মাঠ-প্রান্তর থেকে মানুষজন উধাও হয়ে যায়, সেগুলো পড়ন্ত বিকেলে একবার ঘুরে দেখা দরকার। তা ছাড়া কাল রাতে হিমকুয়াশার পিণ্ডটাকে প্রথম যেখানটায় দেখা গিয়েছিল সে জায়গাটাও একবার খুঁটিয়ে পরখ করা দরকার।

সেইজন্যই প্রিয়নাথ তৈরি হয়ে বেরিয়েছেন। কাঁধে ঝোলা ব্যাগ। তাতে ভূতশিকারির অস্ত্রশস্ত্র।

মিংকির জন্য অপেক্ষা করছিলেন তিনি। মিংকি যদি ওঁর সঙ্গে যেতে চায়।

পাঁচ মিনিটের মধ্যেই মিংকি ফ্রেশ হয়ে ঘর থেকে

বেরিয়ে এল।

'এ কী, ভূতনাথদা! আবার কোথায় চললেন?'

ভূতনাথ হেসে ওকে বললেন, তিনি এখন কোথায় যেতে চান, কী করতে চান। মিংকি যদি চায় তা হলে ওঁর সঙ্গী হতে পারে।

'আমি আপনার সঙ্গেই যাব। নইলে একা-একা থাকলে আমার কেমন আপসেট লাগবে...।'

'আপসেট মানে? ভয় করবে?'

মিংকি কপট রাগে ভূতনাথের দিকে তাকাল ঃ 'কেন চাটছেন, ভূতনাথদা!'

প্রিয়নাথ হাসলেন। তারপর, ব্যস, দুজনে হাঁটা দিলেন।

প্রিয়নাথের মনে হচ্ছিল, গাড়ি করে ঘুরে বেড়ানোর চেয়ে পায়ে হেঁটে ঘুরে বেড়ানোটা অনেক ভালো।

মিংকিকে কথাটা বলতে ও-ও সায় দিল।

ওরা দুজনে উদ্দেশ্যহীনভাবেই হাঁটা দিল।

সামনের দিকে তাকালে কিছু-কিছু গাছপালা, আর বেশিরভাগই খোলামেলা প্রান্তর। বিকেলের পড়ন্ত রোদে কেমন যেন ধূসর ও শান্ত দেখাচ্ছে।

এলোমেলোভাবে অনেকটা পথ হেঁটে বেড়ালেন ভূতনাথ। পথ চলতে-চলতে মাটির দিকে তাকিয়ে তার চরিত্রটা খুঁটিয়ে দেখতে চাইছিলেন। জায়গায়-জায়গায় মাটির বাঁধন ঢিলে ধুলোময়—পলিমাটি শুকিয়ে গেলে যেমনটা দেখায়।

সেই জায়গাগুলো পা দিয়ে খুঁচিয়ে দেখলেন। বেশ কয়েক জায়গায় জোরে-জোরে পা ঠুকলেন। কিন্তু সেরকম কোনও

শব্দ হল না।

মিংকি জিগ্যেস করল, 'পা ঠুকে-ঠুকে কী দেখতে চাইছেন, ভূতনাথদা?'

ভূতনাথ হাসলেন। পকেট থেকে রুমাল বের করে কপালের ঘাম মুছলেন ঃ 'দেখছি না—শুনতে চাইছি। মাঠ থেকে উধাও হয়ে যাওয়া মানুষগুলো কোথায় যায়, সেটাই বুঝতে চাইছি।'

'কোথায় আর যাবে, ভূতনাথদা! ব্যস, দো হি তো জাগা হ্যায় ঃ ইয়া তো উপর, নহি তো নীচে...।'

ঠিক সেই মুহূর্তে একটি লোককে দেখতে পেলেন। অনেকটা দূরে একটা কালো অবয়ব। ভূতনাথদের দিকেই হেঁটে আসছে।

এতদূর থেকে দেখেও বোঝা যাচ্ছিল, সে এখানকারই বাসিন্দা। শর্টকাটের লোভে খুব তাড়াতাড়ি পা ফেলে উপদ্রুত অঞ্চল ডিঙিয়ে যাচ্ছে।

লোকটির দিকে বেশ কয়েক সেকেন্ড তাকিয়ে ছিলেন ভূতনাথ। মনে-মনে কল্পনা করার চেষ্টা করছিলেন, হঠাৎ করে উধাও হয়ে যাওয়ার অলৌকিক ঘটনাগুলো ঠিক কীভাবে ঘটেছিল।

এমনসময় একটা অদ্ভুত দৃশ্য ভূতনাথ আর মিংকি তেওয়ারিকে পাথর করে দিল।

সূর্য ডুবে গিয়ে তখন গোধূলি। কনে-দেখা-আলো ছড়িয়ে গেছে চারিদিকে। ঘরে ফেরা পাখি শিস দিয়ে সঙ্গীসাথীদের ডেকে নিচ্ছে আস্তানায়। একটা বাঁকা চাদ আবছাভাবে উঠে পড়েছে আকাশে। সবমিলিয়ে চারদিকে কোমল প্রশান্তি।

হঠাৎই জোরে বাতাস বইতে শুরু করল।

হেঁটে আসা লোকটির চার-পাঁচ হাত পিছনে মাটিতে আচমকা একটা নিঃশব্দ বিস্ফোরণ ঘটে গেল যেন। রকেটের মতো কিছু একটা মাটি ফুঁড়ে ছিটকে উঠল শূন্যে। ধুলো-মাটি মাখা ভীষণ রোগা একটা চেহারা। চোখের জায়গায় দুটো কালো অন্ধকার গর্ত। এ ছাড়া মাথা থেকে পা পর্যন্ত ধুলোয় ধুলোময়।

কঙ্কালসার ধূসর চেহারাটা ছিটকে বেরিয়ে এসেছে মাটির তলা থেকে। আর তার সঙ্গে তুবড়ির মতো ঠিকরে লাফিয়ে উঠেছে ধুলোর ফোয়ারা। বাতাস সেই ধুলোর ঝড় উড়িয়ে নিয়ে যাচ্ছে অন্য দিকে।

ধুলোমাখা অপার্থিব অবয়বটা দু-লাফে পৌঁছে গেল হেঁটে যাওয়া নিরীহ মানুষটার পিছনে। চোখের পলকে তাকে মরণ-বাঁধনে জাপটে ধরল। তারপর এক লাফে সেঁধিয়ে গেল মাটির ভেতরে। তার অদৃশ্য হওয়ার সাবলীল ভঙ্গি দেখে মনে হল, সে মাটিতে নয়, জলের ভেতরে তলিয়ে গেল।

মিংকি একটা চাপা আর্তনাদ করে উঠল। ভাঙা গলায় কোনওরকমে চেঁচিয়ে বলল, 'ভূতনাথদা! ভূতনাথদা! এ কী দেখছি! আভি-আভি ইয়ে কেয়া হুয়া?'

ভূতনাথ ততক্ষণে অকুস্থল লক্ষ্য করে ছুটতে শুরু করেছেন। মিংকির কথার কোনও জবাব দিলেন না।

মোটা শরীর, বয়েসের ভার আর ঝোলা ব্যাগ নিয়ে ভূতনাথ মোটেই জোরে ছুটতে পারছিলেন না। ফাঁকা মাঠের ওপরে মিংকি একা-একা দাঁড়িয়ে থাকতে চাইছিল না। তাই নিজেকে সামলে নিয়েই ও ভূতনাথের পিছু নিল। এবং খুব সহজেই ওঁকে

ধরে ফেলল।

দশ-বারো সেকেন্ডের মধ্যে স্পটে পৌঁছে গেল ওরা।

না, সেখানে ঝুরো ধুলো-মাটি ছাড়া আর কোনও চিহ্ন নেই। ওই ভয়ঙ্কর প্রাণীটা যেখান থেকে মাটি ফুঁড়ে উঠেছে, আর যেখানে ও লোকটাকে নিয়ে সেঁধিয়েছে, সে-দুটো জায়গায়ই শক্তপোক্ত—কোনও গর্ত-টর্ত সেখানে নেই।

ভূতনাথ চকিতে বসে পড়ে জায়গা দুটো ভালো করে পরখ করে দেখলেন। আঙুল বাঁকিয়ে জায়গা দুটো খোঁড়াখুঁড়ির চেষ্টা পর্যন্ত করলেন। কিন্তু কিছুই পাওয়া গেল না। জায়গা দুটো মাঠের আর পাঁচটা জায়গার মতোই স্বাভাবিক।

শুধু একটা ব্যাপার ভূতনাথকে চমকে দিল।

দুটো জায়গার ঝুরো মাটিই বরফের মতো ঠান্ডা। ঠিক পত্রলোচনের ঘরের দেওয়ালটার মতো।

ভূতনাথ থরথর করে কাঁপছিলেন। ওঁর মাথার শিরা দপদপ করছিল।

আলো কমে এসেছিল। তাই ঝোলা ব্যাগ থেকে টর্চ বের করলেন। মাটিতে টর্চের আলো ফেলে তন্নতন্ন করে দেখলেন। নাঃ, কোনও সূত্র নেই, কোনও চিহ্ন নেই। ঝোলা থেকে নিড্‌ল কম্পাস বের করে চৌম্বকক্ষেত্রের হালচাল দেখতে চাইলেন। সেটা দেখতে গিয়ে চৌম্বক ক্ষেত্রের ভালোরকম পাগলামি লক্ষ করলেন।

মিংকি প্রিয়নাথের খুব কাছ ঘেঁষে উবু হয়ে বসে পড়েছিল। ও প্রিয়নাথের একটা বাহু আঁকড়ে ধরে ছিল। ওর শরীরের ছোট-ছোট কাঁপুনি প্রিয়নাথ টের পাচ্ছিলেন।

কোনও কিছুর হদিস করতে না পেরে প্রিয়নাথ শেষমেশ উঠে দাঁড়ালেন। তার সঙ্গে মিংকিও।

তখনই ওরা দৌড়োদৌড়ির শব্দ শুনতে পেল। অনেকগুলো পা দৌড়োচ্ছে।

অনেকক্ষণ ধরে খেয়াল করার পর প্রিয়নাথ বুঝতে পারলেন, শব্দটা আসছে মাটির তলা থেকে।

প্রিয়নাথের হাত-পা ঠান্ডা হয়ে এল।

তা হলে কি শিকার ধরার পর মাটির নীচে হুল্লোড় চলছে!

কারা আছে মাটির নীচে?

আজ এক্ষুনি যা দেখলেন সেটাই কি ফাঁকা মাঠ থেকে মানুষ উধাও হওয়ার আসল রহস্য?

অন্ধকার ঘন হচ্ছিল। জোরালো হচ্ছিল চাঁদের আলো। চাঁদের দিকে একবার তাকিয়ে মিংকির হাত ধরে টান মারলেন প্রিয়নাথ ঃ 'মিংকি, চলো, লোচনবাবুর ওখানে ফিরে যাই। এই অন্ধকারে খোলা মাঠে দাঁড়িয়ে থাকাটা সেফ নয়। লেট্‌স গো ব্যাক।'

ছুটন্ত পায়ের শব্দ তখনও শুনতে পাওয়া যাচ্ছিল। সেই শব্দ থেকে দূরে সরে যাওয়ার জন্য মিংকি ভেতরে-ভেতরে ছটফট করছিল। ও ভাঙা গলায় হোঁচট খেয়ে বলল, 'এখানে...এখানে আর নয়, কলকাতায় ফিরে চলুন, ভূতনাথদা!'

মিংকির গলায় এমন একটা আর্তি ছিল যে, ভূতনাথ ওর মুখের দিকে তাকালেন।

মেয়েটা সত্যিই খুব ভয় পেয়েছে! কিন্তু ভূতনাথ নিজেও কি ভয় পাননি?

পত্রলোচনের বাড়ির দিকে ফিরে যেতে-যেতে ঠান্ডা বাতাস টের পেলেন। মনে হচ্ছিল যেন বাতাসটার মধ্যেও ভয় মিশে আছে।

কাল রাতের কুয়াশার কথা মনে পড়ে গেল। মাঠের সে-জায়গাটা পরখ করে সন্দেহজনক কিছু খুঁজে পাননি। ওই কুয়াশা কি পাতাল থেকে উঠে আসছিল? নাকি রমাশঙ্কর দত্তের কথাই ঠিক ঃ সব ঘটনারই সায়েন্টিফিক এবং লজিক্যাল এক্সপ্ল্যানেশন আছে।

কিন্তু তাই যদি সত্যি হবে, তা হলে একটু আগে দেখা ওই মর্মান্তিক ঘটনার লজিক্যাল অ্যান্ড সায়েন্টিফিক এক্সপ্ল্যানেশন কী?

রমাশঙ্কর দত্তকে ভয়ঙ্কর ঘটনার কথা বলে কোনও লাভ নেই—কারণ, তিনি এর একটি বর্ণও বিশ্বাস করবেন না। উনি তো স্পষ্ট বলেই দিয়েছেন, নিজের চোখে না দেখলে বা নিজে এক্সপিরিয়েন্স না করলে কোনও ঘটনাকেই তিনি ভৌতিক কিংবা অলৌকিক বলে মেনে নেবেন না।

মিংকির সঙ্গে এসব কথা আলোচনা করছিলেন প্রিয়নাথ আর তাড়াতাড়ি পা চালাচ্ছিলেন। চলার সুবিধের জন্য টর্চের আলো জ্বেলেছিলেন।

মিংকি বলল, 'ভূতনাথদা, আমার খুব ভয় করছে। দিস প্লেস ইজ হন্টেড লাইক এনিথিং। রমাশঙ্করবাবু মানুক ইয়া না মানুক—এখানে আমি আর থাকতে চাই না। আমার এখনও বুক ধড়ফড় করছে।'

ভূতনাথ কী একটা চিন্তায় ডুবে গিয়েছিলেন। মিংকির কথায় ভেসে উঠলেন। বললেন, 'মিংকি, আজকের রাতটা খুব কেয়ারফুলি

কাটাও। মাঠের ব্যাপার কাউকে কিচ্ছু বোলো না। পত্রলোচনবাবুকে আমি যা বলার বলব। আর দেখি, কাল ফেরার ব্যবস্থা করা যায় কি না। আমার মন বলছে, পত্রলোচন এসব ব্যাপারে অনেক কিছুই জানেন। আমাদের সামনে মুখ খুলবেন না। তাই স্রেফ ন্যাকা সেজে আছেন...।'

'মে বি য়ু আর রাইট, ভূতনাথদা—।' মিংকি জোর দিয়ে বলল।

ততক্ষণে ওরা পত্রলোচনের বাড়ির কাছে এসে গেছে।

নয়

পরদিন সকাল সাড়ে ন'টা নাগাদ টাটা সুমো সবাইকে নিয়ে পত্রলোচনের এলাকার হালহকিকত আবার খতিয়ে দেখতে বেরোল।

শুরু থেকেই রমাশঙ্কর দত্ত একটু উশখুশ করছিলেন। কপালের বিরক্তির ভাঁজগুলো তেজ এবং সংখ্যায় বেশ বেড়ে গেছে। চশমার ডাঁটিতে হাত দিয়ে চশমাটাকে বারবার সেট করছিলেন। আর মাঝে-মাঝে আড়চোখে ভূতনাথের দিকে তাকাচ্ছিলেন।

তৃষ্ণা আর মিংকি নিজেদের মধ্যে টিভি চ্যানেল আর ফিল্ম নিয়ে কীসব বলাবলি করছিল আর মাঝে-মাঝেই হেসে গড়িয়ে পড়ছিল। চব্বিশ-পঁচিশ চিরকাল যেমনটা হয় আর কী!

বিনোদকুমার একবার তো বিরক্ত হয়ে বলেই ফেলল, 'ফর গড্‌স সেক! শাট আপ য়ু গাইজ। হাসির ট্যাবলেট খেয়েছ নাকি?'

তৃষ্ণা বিনোদের হাঁটুতে একটা চাপড় মেরে বলে উঠল, 'হ্যাঁ—

খেয়েছি। তুমিও একটা খাবে নাকি, গোমরাথেরিয়াম?'

'গো-গোম...। হোয়াট ইজ দ্যাট?' বিনোদকুমার লাইফে কখনও এইরকম শব্দ শোনেনি। তাই ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে জিগ্যেস করল।

'ইট উইল বি টাফ ফর য়ু, বাডি। ওটা সুকুমার রায়ের লেখা "জুরাসিক পার্ক"-এর অ্যানিম্যাল...।' মিংকি হাসতে-হাসতে বলল।

বিনোদকুমারের মুখ দেখে বোঝা গেল ও কিছুই বোঝেনি। তার ওপরে ওর সহকর্মী দুজন আবার হাসিতে ভেঙে পড়েছে। তাই বেচারা ঠোঁট উলটে মুখের একটা ভঙ্গি করল। তারপর ওর আত্মরক্ষার একমাত্র পথ হিসেবে দু-কানে ইয়ার-প্লাগ গুঁজে দিল।

পত্রলোচন আজ আর ওঁদের সঙ্গী হননি। প্রিয়নাথরাও ওঁকে সেরকমভাবে আর জোর করেননি। পত্রলোচন না থাকায় রমাশঙ্কর বিজয় রাধের পাশে বসেছেন। পিছনের সিটে প্রিয়নাথ জোয়ারদার একা হাত-পা ছড়িয়ে বসেছেন। আর ব্যাক ভেহিক্‌ল কিউবিক্‌ল-এ তৃষ্ণা, মিংকি এবং বিনোদকুমার।

গাড়ি রুক্ষ মাঠের ওপর মেঠো পথ ধরে ধীরে এগোচ্ছিল। গোরুর গাড়ি আর লোকজন চলাচল করে এই মেঠো পথটা মাঠের থেকে চরিত্রে নিজেকে আলাদা করে নিয়েছে।

বিজয় রাধে রিয়ার ভিউ মিরারে তাকিয়ে প্রিয়নাথকে লক্ষ্য করে জিগ্যেস করল, 'কোনদিকে যাব, স্যার?'

জবাব দিলেন রমাশঙ্কর, 'আমরা ওই পুকুর পেরিয়ে ছোট গ্রামটার কাছে যাব—কাল যে-পুকুরটার কাছে ফার্স্টে গেছিলাম...।'

প্রিয়নাথ কিছু একটা বলতে গিয়েও বললেন না। মিংকি, তৃষ্ণা ওদের এসব কথায় কোনও ভ্রূক্ষেপ নেই। ওদের মধ্যে টুরিস্টের

মুডটাই ফুটে উঠেছে। তবে মিংকির মুখের দিকে একপলক তাকিয়ে প্রিয়নাথের যেন মনে হল, ও গতকাল বিকেলের স্মৃতিটাকে প্রাণপণে ভুলতে চাইছে।

চলতে-চলতে গাড়িটা পুকুরের পাশে চলে এসেছিল। প্রিয়নাথ রমাশঙ্করকে বললেন, 'মিস্টার দত্ত, এখানে গাড়ি রাখলে আপনার কি অসুবিধে হবে? কারণ, উটকো ঝামেলা এড়াতে পত্রলোচনবাবুর এলাকার মধ্যেই গাড়ি রাখা ভালো...।'

রমাশঙ্কর কাটা-কাটা উত্তর দিলেন, 'আমার কোনও প্রবলেম নেই।'

বিজয় রাধে সঙ্গে-সঙ্গে গাড়ি থামিয়ে দিয়েছে। এবং গাড়ির রেডিয়ো অন করে গান শুনতে শুরু করেছে।

ওঁরা সবাই একে-একে গাড়ি থেকে নেমে পড়লেন। তারপর এদিক-ওদিক ছড়িয়ে পড়তে লাগলেন। বিনোদকুমার ওঁদের ঘোরাফেরা আর কথাবার্তার ছবি তুলে রাখতে লাগল।

প্রিয়নাথ খুব মনোযোগ দিয়ে মাঠের চেহারা দেখছিলেন। উবু হয়ে বসে পকেট থেকে ডিজিটাল ক্যামেরা বের করে মাঠের চরিত্রের ফটো তুলছিলেন। ওঁকে দেখে মনে হচ্ছিল, কোনও ক্রিকেট টিমের ক্যাপ্টেন যেন একটা মরণ-বাঁচন খেলার আগে খুঁটিয়ে পিচ পরীক্ষা করছেন।

মিংকি তৃষ্ণাকে ছেড়ে ভূতনাথের কাছে এগিয়ে এল। চাপা গলায় জিগ্যেস করল, 'ভূতনাথদা, এনি সাইন?'

প্রিয়নাথ আনমনাভাবে কখন যেন একটা উইল্‌স ফিলটার ধরিয়ে ফেলেছেন। ধোঁয়া ছেড়ে মিংকির দিকে মুখ তুলে তাকালেন।

মাথা নাড়লেন এপাশ-ওপাশ। না, গতকাল বিকেলের কোনও চিহ্ন নেই।

শুকনো মাঠের ওপরে সরু-সরু ফাটলের দাগ। সেদিকে তাকিয়ে প্রিয়নাথ যেন কল্পনায় দেখতে পেলেন, দাগগুলো চওড়ায় বড় হচ্ছে। বড় হতে-হতে অন্ধকার অতল খাদের চেহারা নিচ্ছে।

'মিস্টার সিন্‌হা রয়কে কালকের কেস কিছু বলেছেন নাকি?' মিংকি জানতে চাইল।

'নাঃ, এখনও দোনামনায় আছি—।'

'দোনামনা মানে?' মিংকির ভুরু কুঁচকে গেল।

ওর দিকে তাকিয়ে হেসে ফেললেন প্রিয়নাথ ঃ 'দোনামনা মানে ইন টু মাইন্ডস...।'

'ও—। তো কখন বলবেন? আপনিই তো কাল বললেন, পত্রলোচনবাবু পসিব্‌লি অনেক কিছু জানেন।'

'হুঁ। কিন্তু ওঁকে কিছু জিগ্যেস করার আগে আমি আর-একটু ভাবতে চাই...।'

হঠাৎই প্রিয়নাথের চোখ গেল রমাশঙ্করের দিকে। বাঁ-হাতে ওঁর ব্যাগ ঝুলছে। ডানহাতে ব্যস্ত মোবাইল ফোন ঃ হয়তো কারও সঙ্গে কথা বলছেন কিংবা কথা বলার চেষ্টা করছেন। তবে একইসঙ্গে ভদ্রলোক পুকুর পেরিয়ে গ্রাম লক্ষ্য করে হেঁটে চলেছেন।

গ্রামের দিকে থেকে গোরুর 'হাম্বা' রব ভেসে এল। ফাঁকা জায়গা বলে বহু দূরের শব্দও বেশ শোনা যায়। কুঁড়েঘরগুলোর পাশ ঘেঁষে কয়েকজন মানুষকে হেঁটে যেতে দেখা গেল। পুকুরটায়

আজ কেউ বাসন মাজছে না কিংবা স্নান করছে না।

রমাশঙ্কর দত্ত গ্রামের মানুষগুলোর কুঁড়েঘর আর সবজি-বাগানের কাছে পৌঁছে গেলেন।

প্রিয়নাথ রমাশঙ্করের অস্থির অবস্থাটা বেশ বুঝতে পারছিলেন। তিনি সেক্রেটারি হিসেবে 'যুক্তিবাদ প্রসার সমিতি'-র হাতে এখনও পর্যন্ত কোনও সলিড প্রমাণ তুলে দিতে পারেননি। তাই বেশ চাপে আছেন। গতকাল প্রিয়নাথকে তিনি জপেশ্বর মালিকের সঙ্গে কথাবার্তা বলতে দেখেছেন। কালই যদি রমাশঙ্কর গাঁয়ের লোকজনকে জিজ্ঞাসাবাদের ঘটা দেখাতেন তা হলে 'দুষ্ট' লোকে বলত, তিনি ভূতনাথকে 'কপি' করছেন। তা ছাড়া একদফা জিজ্ঞাসাবাদ হয়ে যাওয়ার পর লোকজন সতর্ক হয়ে যায়, তাদের মধ্যে রেজিস্ট্যান্স তৈরি হয়।

রমাশঙ্কর ভাবেননি, চপলকেতুর বুজরুকি ফাঁস করতে এত সময় লাগবে। এর প্রধান কারণ, পত্রলোচন সিংহ রায় মানুষটা অত্যন্ত ধুরন্ধর—অন্তত রমাশঙ্করের তাই ধারণা। তা ছাড়া আজ সকালে চায়ের আসরে প্রিয়নাথ জোয়ারদারকে দেখে ওঁর মনে হয়েছে, প্রিয়নাথ কিছু একটা আড়াল করতে চাইছেন। মিংকি তেওয়ারি নামের মেয়েটার সঙ্গে মাঝেমধ্যেই কীসব ইশারা করছেন।

গ্রামে ঢুকে হাতের কাছেই একজন যুবককে পেয়ে গেলেন রমাশঙ্কর। যুবকটির নাম সাতকড়ি জানা—ডাকনাম সাতু। বয়েস সাতাশ-আটাশ। জমি চাষবাস করে পেট চালায়। ওর হাতে একটা দড়ির লাছি।

কাল এ-গ্রামে খোঁজখবর করার সময় প্রিয়নাথ যে কোল্ড স্টোরেজ খোলার গল্প ফেঁদেছেন সেটা রমাশঙ্কর জানেন। কারণ, রাতে খাওয়ার সময় প্রিয়নাথ কথায়-কথায় পত্রলোচনকে ব্যাপারটা বলছিলেন।

সাতুর সঙ্গে আলাপ শুরু করলেন রমাশঙ্কর।

'এখানে একটা বড়সড়ো কোল্ড স্টোরেজ খোলার কথা ভাবছি আমরা। তাই...তাই জমি দেখতে এসেছি...।'

সাতকড়ি জানা চুপ। শুধু আপনমনে দড়ির লাছিটা নাড়াচাড়া করছে।

ছেলেটার খালি গা। স্বাস্থ্যবান। মাথায় তরুণ বয়েসের ঝাঁকড়া চুল। ভাঙা গাল। বাঁ-কাঁধে একটা বড় কাটা দাগ।

ওর পায়ে ময়লা প্যান্ট। তার নীচের দিকটা প্রায় হাঁটু পর্যন্ত গোটানো। দু-পা এবং পায়ের হাওয়াই চপ্পল কাদায় মাখামাখি। এমনকী প্যান্টের অনেক জায়গাতেও কাদা লেগে আছে।

সাতুকে চুপ করে থাকতে দেখে রমাশঙ্কর ওকে উসকে দিতে চাইলেন।

'পত্রলোচন সিংহ রায়কে চেনো?'

'হ্যাঁ—' মাথা হেলাল সাতু ঃ 'জমিদার মানুষ।'

তারপরই আবার চুপ।

'ওঁর জমিতেই আমাদের কোল্ড স্টোরেজটা করব ভাবছি...।'

'ওনার অনেক জমিজমা—তবে চাষবাস হয় না।'

রমাশঙ্কর যেন ব্যাটসম্যানের ব্যাট আর উইকেটের মধ্যে ফাঁক দেখতে পেলেন। সঙ্গে-সঙ্গে একটা জোরালো ইন সুইংগার

ছুড়ে দিলেন।

'কেন, কেন? চাষবাস হয় না কেন?'

সাতু জানা এদিক-ওদিক তাকাল—যেন কাউকে খুঁজছে।

চারপাশে ঝকঝকে রোদ। গাছগাছালি আর কুঁড়েঘরের গাঢ় ছায়া। একটা ছাগলছানার ডাক শোনা গেল। দূরে চারটে হাঁস হেলেদুলে হেঁটে চলেছে। মাথার ওপরে নীল আকাশ। সেখানে ছোট-ছোট তুলোর ডেলার মতো মেঘ যেন আঠা দিয়ে লাগানো।

রমাশঙ্কর সাতকড়ির মুখ খোলার জন্য অপেক্ষা করছিলেন। কিন্তু ছেলেটা মুখে কুলুপ এঁটে দাঁড়িয়ে—যেন সেও অপেক্ষা করছে।

রমাশঙ্কর আবার জোরালো বল দিলেন ঃ 'পত্রলোচনের জমিতে মনে হয় কোনও গণ্ডগোল আছে।'

'আছে তো!' মাথা ঝাঁকাল সাতু জানা।

'কী গণ্ডগোল?' রমাশঙ্কর এতক্ষণে ধৈর্যের খাদের কিনারায় এসে পড়েছেন।

'কাল তো জপেশ্বরদাদার কাছে সব শুনেছেন। তাইলে আবার জিগাস করছেন কেন?' আচমকা মন্তব্য করল সাতু। সব-ধরে-ফেলেছে এমন নজরে তাকিয়ে রইল রমাশঙ্করের দিকে।

রমাশঙ্কর জপেশ্বরের নামও শোনেননি, তার গল্পও শোনেননি। কিন্তু বুঝতে পারলেন সাতু কী বলতে চাইছে।

তাই সাততাড়াতাড়ি বলে উঠলেন, 'ওই টাকমাথা ভদ্রলোক আমার বিজনেসের পার্টনার—' আঙুল তুলে দূরে দাঁড়ানো প্রিয়নাথের দিকে ইশারা করলেন রমাশঙ্কর ঃ 'কিন্তু আমার সঙ্গে

চাপা খটাখটি আছে। তা তুমি ভাই পত্রলোচনের জমির গণ্ডগোলের কেসটা একটু বুঝিয়ে বলো না—।'

'কী আর বলব। দেখছেন তো আমার পায়ের হাওয়াই চপ্পলের হাল। এ পরে কি আর খেতজমিতে কাজ করা যায়? কিন্তু আমার তো আর জপেশ্বরদাদার মতো সোনা কপাল নয়, ফাটা কপাল। তাই এই ছেঁড়াখোঁড়া চপ্পল দে কাজ চালাচ্ছি। নতুন জুতো কিনব তার পয়সা কোথায়!'

রমাশঙ্কর বেশ অবাক হয়ে গেলেন। সাতকড়ির চাতুর্যকে সেলাম জানাতে হয়। 'অতি ধীর বক্রগতিতে' সে পয়সার প্রসঙ্গে এসে গেছে।

কাল প্রিয়নাথ যে জপেশ্বরকে—বা পুকুরপাড়ের সেই লোকটাকে—টাকা দিয়েছেন, সেটা রমাশঙ্করের নজর এড়ায়নি। এই সাতু জানা নিশ্চয়ই জপেশ্বরের কাছে সেই অর্থাগমের গল্প শুনেছে। তারপর...।

নাঃ, লেখাপড়া শিখলে সাতকড়ি জানা নিশ্চয়ই হাইকোর্টের উকিল হত।

রমাশঙ্কর আর সময় নষ্ট করলেন না। পকেট থেকে একটা একশো টাকার নোট বের করে সাতকড়ির হাতে দিলেন।

সাতু দাঁত বের করে হেসে বলল, 'জপেশ্বরদাদা এরকম দু-পিস পেয়েছে—।'

সুতরাং আর-একটা নীল রঙের নোট সাতুকে দিতে হল।

তারপর ছেলেটা মুখ খুলল, দড়ির লাছিটা কাঁধের ওপরে ফেলে বলতে শুরু করল।

জপেশ্বর মালিক যা-যা প্রিয়নাথকে বলেছিল মোটামুটি সেই খবরগুলোই দিল সাতকড়ি। তবে বাড়তি খবর হিসেবে জানাল, ওর দুটো ছাগল তিন বছর আগে এই মাঠ থেকে উধাও হয়ে গেছে। এ ছাড়া গত বছরে ও অদ্ভুত একটা ব্যাপার দেখেছে—নিজের চোখে।

সময়টা ছিল ঘোর দুপুর। হাল চাষের বলদ জোড়ার খাবার নিয়ে ও এই মাঠের ওপর দিয়ে যাচ্ছিল। একটা নেড়ি কুকুর মাঠের এখানে-সেখানে এঁটোকাঁটা খুঁজে খাওয়ার চেষ্টা করছিল।

হঠাৎই সাতকড়ি দেখতে পায় মাটি ফুঁড়ে তিরের মতো ছিটকে শূন্যে লাফিয়ে উঠল একটা ধুলোমাখা শীর্ণ চেহারা। এবং সেই অদ্ভুত প্রাণীটা পুকুরে ব্যাংবাজির মতো তিন লাফে পৌঁছে গেল কুকুরটার কাছে। কিন্তু তার আগেই ভয় পাওয়া কুকুরটা 'কেঁউ' করে ডেকে প্রাণভয়ে ছুটতে শুরু করল।

কুকুরটা দিশেহারা হয়ে এলোমেলো দৌড়োচ্ছিল। কিন্তু তাতে শেষরক্ষা হল না। কয়েক সেকেন্ডের মধ্যেই সেই ধুলোমাখা কঙ্কালসার প্রাণীটা চার-পাঁচটা অলৌকিক লাফে বেচারি কুকুরটিকে ধরে ফেলল। তখন কুকুরটার সে কী মরণ চিৎকার!

তারপরই কী এক ম্যাজিকে কুকুরটা সমেত ওই প্রাণীটা মাটির মধ্যে তলিয়ে গেল।

এই ঘটনা দেখে সাতকড়ি ভীষণ ভয় পেয়ে গিয়েছিল। পরপর দুটো রাত্তির ও ঘুমোতে পারেনি। আর ভয়ে কাউকে এ-কথা বলতেও পারেনি। তবে এখন সে 'বাবু'-র কাছ থেকে নিমক খেয়েছে—হাতে ধরা নোট দুটো উঁচিয়ে দেখাল সাতু—তাই বুকে

চেপে রাখা কথাগুলো বলছে। 'বাবু' যে সাতকড়ি জানার কাছ থেকে এসব কথা শুনেছেন, সেটা তিনি যেন কাউকে না বলেন।

সাতকড়ির সঙ্গে কথা শেষ হতে না হতেই তিন-চারজন গ্রামবাসী কৌতূহলে রমাশঙ্করের কাছে এসে দাঁড়াল। ওদের ঠেকাতে রমাশঙ্কর আবার হিমঘরের গল্প শোনালেন। এবং পত্রলোচনের জমি নিয়ে সবাইকে কমবেশি কিছু জিজ্ঞাসাবাদ করলেন।

কিন্তু সেরকম কিছু জানা গেল না।

তখন রমাশঙ্কর গাড়িতে ফিরে যাওয়ার জন্য পা বাড়ালেন। পকেট থেকে নোটবই আর পেন বের করে ছোট-ছোট মন্তব্য লিখতে লাগলেন। পথ চলার জন্য অক্ষরগুলো আঁকাবাঁকা হয়ে যাচ্ছিল। রমাশঙ্কর হাঁটার গতি কমিয়ে দিলেন।

গাড়ির কাছে পৌঁছে সবাইকে দেখিয়ে এবং শুনিয়ে হাত ছুড়ে বলে উঠলেন, 'যত্ত সব বোগাস গালগল্প!' তারপর প্রিয়নাথের দিকে তাকিয়ে হেসে বললেন, 'রূপকথা শোনার জন্যে দুশো টাকা গচ্চা গেল। কাল আপনিও তো জপেশ্বর নামের একটা লোককে দুশো টাকা দিয়েছেন...।'

প্রিয়নাথ শান্ত গলায় বললেন, 'হ্যাঁ, দিয়েছি। কারণ, ওরা আমাদের তুলনায় অনেক সৎ। আমি ওকে মিথ্যে কথা বলেছি যে, আমরা এখানে কোল্ড স্টোরেজের ব্যাবসার জন্যে জমি দেখতে এসেছি। কিন্তু জপেশ্বর মালিক সত্যি কথা বলেছে—আমার মতো ভাঁওতা দেয়নি।' একটু থেকে তারপর ঃ 'তো আপনি ওই ছেলেটাকে কী ভাঁওতা দিলেন?'

রমাশঙ্কর থতোমতো খেয়ে বললেন, 'ওই...কোল্ড স্টোরেজ।' তারপর তাড়াতাড়ি গিয়ে গাড়িতে উঠে পড়লেন।

মিংকি ঠোঁট টিপে হেসে ফেলেছিল।

প্রিয়নাথ ওকে জিগ্যেস করলেন, 'কী হল, হাসছ কেন?'

'না, ভূতনাথদা, তেমন কিছু নয়। শুধু ভাবছিলাম, যুক্তিবাদীরাও তা হলে মিথ্যেবাদী হয়!'

এ-কথায় তৃষ্ণাও ঠোঁট চওড়া করে হেসে ফেলল।

দশ

সারাদিনে আর নতুন কিছু হয়নি, কিন্তু প্রিয়নাথের অস্বস্তি বাড়ছিল। রমাশঙ্করের হাবভাব দেখে ওঁর মনে হচ্ছিল, মানুষটা যেন একটু নাড়া খেয়ে গেছে।

নানান চিন্তায় রাতে কিছুতেই ঘুম আসছিল না প্রিয়নাথের। বিছানায় শুয়েও উশখুশ-উশখুশ করছিলেন। গরমটা যেন আজ বেশি লাগছে। অথচ মাথার কাছে দুটো জানলাই খোলা।

নামে দুটো হলেও জানলা আসলে একটাই, তবে লম্বা জানলাটার পেটের কাছে কাঠের ফ্রেম দিয়ে আড়াআড়ি দু-ভাগ করা। ওপরে-নীচে দুটো করে পাল্লা, আর কাঠের গরাদ। খুব পুরোনো আমলের বাড়ি-টারিতে যেমন দেখতে পাওয়া যায়।

ঘর অন্ধকার। হ্যারিকেনের সলতেটা এতই কমানো যে, কোনও আলো দেখা যাচ্ছে না।

প্রিয়নাথ শুয়ে-শুয়ে মাঠের সেই ভয়ঙ্কর ঘটনাটার কথা ভাবছিলেন। নিজের চোখে না দেখলে এ-ঘটনা বিশ্বাস করা কঠিন। পুরো ঘটনাটা ঘটতে সময় লেগেছে পাঁচ সেকেন্ডেরও কম। বলতে গেলে, এই দেখলাম, এই নেই।

প্রিয়নাথ সবচেয়ে বেশি আশ্চর্য হয়েছেন পত্রলোচনের আচরণে।

দেওয়ালে অদ্ভুত ছায়া দেখে একটা মানুষ না হয় নির্বিকার থাকতে পারে। কিন্তু মাঠের ভয়ঙ্কর ঘটনাটা!

অনেক ইতস্তত করার পর প্রিয়নাথ আজ রাতে যখন পত্রলোচনকে একপাশে ডেকে নিয়ে নীচু গলায় মাঠের মর্মান্তিক ঘটনাটার কথা জানালেন, তখন ওঁর প্রতিক্রিয়া সত্যিই অবাক হওয়ার মতো।

'আপনি কি ব্যাপারটা স্বচক্ষে দেখেছেন?'

'বলছি তো, নিজের চোখে দেখেছি—।'

'কতটা দূর থেকে দেখেছেন?'

'তা কিছুটা দূর থেকে বলতে পারেন...।'

'তা হলে কি স্পষ্ট দেখতে পেয়েছেন?'

প্রিয়নাথের ধৈর্য ক্রমশ কমে আসছিল। তাই কিছুটা বিরক্তভাবে নীচু গলায় বললেন, 'পুলিশে খবর দেওয়ার মতো স্পষ্ট দেখতে পেয়েছি...।'

পত্রলোচন তখন ভগবানকে ডাকার ভঙ্গিতে সিলিং-এর দিকে মুখ তুলে তাকিয়েছেন। কয়েক সেকেন্ড চুপচাপ থেকে তারপর বলেছেন, 'জোয়ারদারবাবু, এসবই প্রাকৃতিক ঘটনা। এর মধ্যে থানা-পুলিশ ডেকে এনে কোনও লাভ নেই। তা ছাড়া আমাদের

লোকাল ফাঁড়ির পুলিশরা এসব ঘটনার কথা জানে।' আপনমনে এপাশ-ওপাশ মাথা নাড়লেন পত্রলোচন। তারপর ঃ 'বুঝেছি, ওঁরা ভীষণ অস্থির হয়ে পড়েছেন। বাইরের মানুষজন এসে ডিসটার্ব করলেই এরকম সমস্যা হয়। সমস্যা বাড়ে। আমি...আমি টিভির লোকজনদের গোড়াতেই এ-কথা বলেছিলাম। কিন্তু ওরা মানতে চাইলে তো!'

'ওঁরা অস্থির হয়ে পড়েছেন মানে? কাদের কথা বলছেন আপনি?'

স্থির দৃষ্টিতে প্রিয়নাথের দিকে কিছুক্ষণ তাকিয়ে রইলেন পত্রলোচন। তারপর আবার মুখ তুললেন সিলিং-এর দিকে। এবার হাতজোড় করে চোখ বুজলেন। আপনমনে কীসব বললেন।

আরও কিছুক্ষণ সময় নেওয়ার পর নীচু গলায় বললেন, 'আমার যাঁরা প্রণমিত, তাঁরা অস্থির হয়ে পড়েছেন...ভীষণ অস্থির হয়ে পড়েছেন...। ওঁদের শান্ত করা দরকার...শান্ত করা দরকার...।'

এমন সময় অন্দরের দরজার পাল্লা ফাঁক করে পত্রলোচনের স্ত্রী ছোট্ট করে উঁকি মেরেছেন। চোখে সেই কালো চশমা। পরনে একটা লাল পাড় আধময়লা শাড়ি।

প্রিয়নাথ বুঝলেন, রাতের খাওয়ার আয়োজন শুরু হতে চলেছে।

কিন্তু পত্রলোচনের কথাগুলো প্রিয়নাথের কানে সমানে বাজছিল। আর বাজছিল বলেই হয়তো ওঁর ঘুম আসছিল না।

প্রিয়নাথ জীবনে অনেক অতিপ্রাকৃত, অলৌকিক, ভৌতিক ঘটনা দেখেছেন। কিন্তু তা সত্ত্বেও বিকেলের পড়ন্ত আলোয় দেখা

ওই ভয়ঙ্কর ঘটনাটা তিনি নিতে পারছিলেন না। মাটি ফুঁড়ে লাফিয়ে বেরিয়ে আসা ওই প্রাণীটা কী? কোথায় গেল ওটা নিরীহ মানুষটাকে নিয়ে?

অন্ধকারে জেগে থাকতে-থাকতে ঘুমের ওপরে ঘেন্না ধরে গেল ভূতনাথের। তাই বিছানায় উঠে বসলেন। বালিশের পাশ থেকে চশমা নিয়ে চোখে দিলেন। ঘড়ি দেখলেন ঃ রাত দেড়টা।

জানলা দিয়ে রাত দেখা যাচ্ছে। তার সঙ্গে গাছের কয়েকটা ডালপালা এবং পাতাও। একটা পাখির ডাক কানে এল। ডাকটা অনেকটা কান্নার মতো শোনাল।

এবার উঠে দাঁড়ালেন। অন্ধকারে হাতড়ে দড়িতে ঝোলানো পাঞ্জাবিটা খুঁজে পেলেন। ওটা গায়ে চড়িয়ে নিয়ে ঝোলা ব্যাগ হাতড়াতে শুরু করলেন। টর্চটা পেয়ে তুলে নিলেন। পাঞ্জাবির পকেটে ঢোকালেন। তারপর দরজা খুলে বাইরে বেরিয়ে এলেন।

মাথার একটা পাশ দপদপ করছিল। এপাশ-ওপাশ তাকিয়ে পকেট থেকে সিগারেট আর লাইটার বের করলেন। একটা সিগারেট ধরালে দপদপানিটা কমতে পারে।

সিগারেটে একটা লম্বা টান দিয়ে আকাশের দিকে তাকালেন। আকাশ আকাশের জায়গাতেই রয়েছে, চাঁদ চাঁদের জায়গায়।

রাতের প্রকৃতি দেখতে-দেখতে অনেকটা এগিয়ে গেলেন। সামনে গাছপালা, খোলা মাঠ। একাদশী কি দ্বাদশীর চাঁদ ওর সাধ্যমতো জ্যোৎস্না ঢেলে দিচ্ছে। চপলকেতুকে আরও মায়াময় লাগছে এখন।

প্রিয়নাথের ভেতরে টানাপোড়েন চলছিল। একইসঙ্গে

সিগারেটটাও ছোট হচ্ছিল।

এরকম একটা ভয়ঙ্কর ঘটনার সাক্ষী হয়ে সেটা নিয়ে মুখ বুজে থাকা যায় না। কিন্তু কেউ কি এই অবিশ্বাস্য ঘটনা বিশ্বাস করবে?

একটা গাছের ছায়ার নীচে এসে পড়েছিলেন। সিগারেটটা বাঁ-হাতে নিয়ে ডান পকেট থেকে টর্চটা বের করে নিলেন। কিন্তু একটা দৃশ্য দেখে থমকে গেলেন।

প্রায় চল্লিশ-পঞ্চাশ মিটার দূরে একটা ছায়ামূর্তি হেঁটে চলেছে। জ্যোৎস্না পড়েছে তার গায়ে।

ছায়ামূর্তিটা এতই লম্বা যে, সহজেই তাকে চেনা গেল ঃ পত্রলোচন সিংহ রায়।

এত রাতে কোথায় যাচ্ছেন পত্রলোচন? ওঁর হাতে একটা পুঁটলি। ওই পুঁটলির মধ্যেই বা কী?

সিগারেটটা চট করে একটা গাছের গুঁড়িতে ঘষে নিভিয়ে ফেলে দিলেন। টর্চটা ঢুকিয়ে দিলেন পকেটে। তারপর খুব সতর্ক হয়ে পত্রলোচনকে অনুসরণ করলেন।

প্রিয়নাথের মাথার খুব কাছ দিয়ে একটা বড় সাদা প্যাঁচা উড়ে গেল। প্রিয়নাথ চমকে মাথা সরিয়ে নিলেন।

চারপাশে কোনও শব্দ নেই। নির্জন রাত। শুধু দুটো ছায়া হেঁটে চলেছে। চাঁদের আলোয় মাটিতে ওদের ছায়া পড়েছে। চাঁদ আকাশ থেকে এই চারটে ছায়াকে দেখছিল।

পত্রলোচন ধীরে-ধীরে গিয়ে হাজির হলেন চণ্ডীমণ্ডপে। দেবীর ভাঙাচোরা বিগ্রহের দিকে এগিয়ে গেলেন। প্রিয়নাথ ওঁকে আর দেখতে পাচ্ছিলেন না। অন্ধকার ওঁকে জড়িয়ে নিয়েছিল।

প্রিয়নাথ তাড়াতাড়ি পা চালিয়ে চণ্ডীমণ্ডপের কাছে চলে এলেন। একটা গাছের আড়ালে লুকিয়ে কান পেতে অপেক্ষা করতে লাগলেন।

হঠাৎই ওঁর কানে এল মন্ত্রপাঠ। পত্রলোচন মন্ত্র পড়ছেন। উচ্চারণ যথেষ্ট বিকৃত হলেও প্রিয়নাথ বুঝতে পারলেন, কারণ তিনিও নিয়মিত চণ্ডীপাঠ করেন।

পত্রলোচন রাত্রিসূক্ত পড়ছিলেন ঃ

'ওঁ রাত্রি ব্যখ্যদায়তী পুরুত্রা দেব্যক্ষভিঃ।
বিশ্বা অধি শ্রিয়োহধিত।।
ওর্বপ্রা অমর্ত্যা নিবতো...।'

কিছুক্ষণ ধরে পত্রলোচনের মন্ত্রপাঠ চলল। তারপর তিনি যে-কথাগুলো বলতে লাগলেন সেগুলো ভারী অদ্ভুত।

'...আপনারা আমার প্রণাম নিন। আপনারা শান্ত হোন। আপনারা তুষ্ট হোন, তৃপ্ত হোন। আমি আপনাদের প্রণাম করি। আপনাদের আশীর্বাদ দিয়ে আমাকে ধন্য করুন। আপনারা শান্ত হোন...।'

এই একই কথা পত্রলোচন বেশ কয়েকবার মন্ত্রের মতো আওড়ে গেলেন। তারপর চণ্ডীমণ্ডপ থেকে বেরিয়ে ফেরার পথ ধরলেন।

সঙ্গে-সঙ্গে প্রিয়নাথ চণ্ডীমণ্ডপে ঢুকে পড়লেন। পকেট থেকে টর্চ বের করলেন। টর্চের মুখে হাত চাপা দিয়ে আলো জ্বাললেন। সেই চাপা আলোয় দেখলেন, বিগ্রহের সামনে অনেক টাটকা ফুল ছড়িয়ে আছে, আর একটা খালি পলিথিনের প্যাকেট পড়ে আছে

একপাশে।

প্রিয়নাথ টর্চ নিভিয়ে ফেরার পথ ধরলেন। তাড়াতাড়ি পা চালিয়ে একটু পরেই পত্রলোচনের ছায়ামূর্তিকে দেখতে পেলেন। প্রিয়নাথ খুব সাবধানে পিছু নিলেন। মনে হল, পত্রলোচন ওঁর বাড়ির দিকেই ফিরে চলেছেন।

বাড়ির বেশ কাছাকাছি এসে পড়ার পর প্রিয়নাথ আরও তাড়াতাড়ি পা চালালেন। কোনওরকম শব্দ না করে পত্রলোচনের দু-চার হাতের মধ্যে পৌঁছে গেলেন।

'পত্রলোচনবাবু—।'

পত্রলোচনের ছায়া থমকে দাঁড়াল। ঘুরে তাকাল।

প্রিয়নাথ মানুষটার মুখের ওপরে টর্চের আলো ফেললেন ঃ 'এত রাতে কোথায় গিয়েছিলেন?'

'কে, প্রিয়নাথবাবু?' পত্রলোচনের মুখে নির্বিকার ভাবটা এখন নেই। তার বদলে একটা কাচুমাচু ভাব ফুটে উঠেছে। যেন লুকিয়ে চুরি করতে গিয়ে হাতেনাতে ধরা পড়ে গেছেন।

'এত রাতে কোথায় গিয়েছিলেন আপনি?' টর্চ নিভিয়ে প্রশ্নটা আবার করলেন প্রিয়নাথ।

'চণ্ডীমণ্ডপে গিয়েছিলাম—পুজো করতে।'

'রাতে চণ্ডীপাঠ করতে হলে রাত্রিসূক্ত আগে পাঠ করতে হয়—।'

'জানি। সেইজন্যেই তো রাত্রিসূক্ত আগে বলছিলাম...।' প্রিয়নাথ যে ঠিক কী করতে চান সেটা পত্রলোচন বুঝতে পারছিলেন না। তাই চুপ করে রইলেন।

'শেষের ওই মন্ত্রের "আপনারা" কারা? কাদের উদ্দেশ করে আপনি মন্ত্র পড়ছিলেন?'

এবারেও পত্রলোচন চুপ করে রইলেন।

'লোচনবাবু, আমার প্রশ্নের উত্তর না দিলে আপনার সাংঘাতিক বিপদ হবে। আসুন, ওইখানটায় একটু বসি—' টর্চ জ্বেলে পত্রলোচনের বাড়িতে ঢোকার সিঁড়ির ধাপের দিকে দেখালেন প্রিয়নাথ। তারপর সেদিকে এগোলেন।

প্রথম ধাপটায় গিয়ে বসলেন দুজনে। স্পষ্টই বোঝা যাচ্ছিল, পত্রলোচন উশখুশ করছেন।

প্রিয়নাথ বললেন, 'লোচনবাবু আমরা কথাবার্তা খুব নীচু গলায় বলব—যাতে কেউ শুনতে না পায়। শুনতে পেলে আপনারই অসুবিধে। আপনার স্ত্রী বা ছেলের কাছে এ নিয়ে হয়তো আপনাকে পরে জবাবদিহি করতে হতে পারে...।'

পত্রলোচন চুপ করে রইলেন।

কয়েক সেকেন্ড অপেক্ষা করার পর প্রিয়নাথ বলতে শুরু করলেন, 'আপনি যদি আমার প্রশ্নের জবাব না দেন তা হলে আমি কী-কী করব সেটা আগে বলি। আমি কলকাতায় গিয়ে খবরের কাগজ আর টিভি চ্যানেলের রিপোর্টার আর জার্নালিস্টদের চপলকেতুর কথা জানাব। জানাব যে, আমি নিজের চোখে একজন মানুষকে মাটির নীচে তলিয়ে যেতে দেখেছি। এরকম অনেক মানুষ এখানে মাটির নীচে উধাও হয়ে গেছে।'

'এখানকার পুকুরের জল মাঝে-মাঝে দুলে ওঠে। ভূমিকম্পের সময় যেমন হয়। তা ছাড়া এখানে মাঠে, দেওয়ালে অপদেবতার

ছায়া দেখা যায়। ছায়াগুলো সব এলোমেলো ছুটে বেড়াচ্ছে।'

'এসব কথা প্রচার হওয়ার সঙ্গে-সঙ্গে আপনার জমিদারিতে পুলিশ হানা দেবে। তারপর মাটির তলায় কী আছে খোঁজ করার জন্যে ফায়ার ব্রিগেড আর আর্মি এখানে এসে হাজির হবে। তার সঙ্গে কয়েকডজন সাংবাদিক আপনার এলাকায় এসে কিলবিল করবে। তার ওপরে আমি যদি বলি, এখানকার লোকজনের সন্দেহ এখানে মাটির নীচে নবাবি আমলের গুপ্তধন আছে, তা হলে তো হয়েই গেল! চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে আপনি একটা মুহূর্তও শান্তি পাবেন না।'

'কিন্তু এসব মিথ্যে আপনি কেন বলবেন?' পত্রলোচন অবাক হয়ে জিগ্যেস করলেন।

'বলব জনগণের স্বার্থে।' কঠিন গলায় বললেন ভূতনাথ, 'এইসব মিথ্যে প্রচারের সঙ্গে আরও একটা কথা জুড়ে দেব ঃ এখানকার ভণ্ড জমিদার পত্রলোচন সিংহ রায় এ সবকিছুর নাটের গুরু। উনি সব জানেন—সব প্রশ্নের উত্তর জানেন। তখন কী অবস্থা হবে বুঝতে পারছেন?'

'জোয়ারদারবাবু, দয়া করে আমার এই সর্বনাশটি করবেন না। এমনিতেই আমি সর্বনাশের মধ্যে ডুবে আছি—' পত্রলোচনের গলা কাঁদো-কাঁদো শোনাল। প্রিয়নাথের একটা হাত চেপে ধরলেন ঃ 'আপনি জানেন না, আমি কী সর্বনাশের মধ্যে ডুবে আছি। আমাকে দয়া করুন...বাঁচান...।'

কাতর মানুষটাকে দেখে প্রিয়নাথের খুব খারাপ লাগছিল। কিন্তু আজ বিকেলে যে-রক্তহিম করা দৃশ্য দেখেছেন তার চেয়ে খারাপ

আর কিছুই হতে পারে না। তাই ভূতনাথ ঠান্ডা গলায় পুরোনো প্রশ্নটাই করলেন, 'আপনি কাদের জন্যে ওই মন্ত্র পড়ছিলেন? "আপনারা" মানে কারা?'

প্রিয়নাথের হাতটা ছেড়ে দিলেন পত্রলোচন। কয়েক মুহূর্ত গুম হয়ে থেকে বললেন, 'আমি আমার পূর্বপুরুষদের জন্যে ওই মন্ত্র পড়ছিলাম। আমার বাপ-ঠাকুরদা কাকা-জ্যাঠা সবার জন্যে...।'

'কেন? ওঁদের জন্যে মন্ত্র পড়ছিলেন কেন?'

'ওদের শান্ত রাখার জন্যে...।'

'তাঁরা এখন কোথায়? তাঁরা কি কেউ বেঁচে আছেন?'

কিছুক্ষণ চুপ করে থাকার পর পত্রলোচন আলতো গলায় জবাব দিলেন, 'না...বেঁচে নেই।'

এবার প্রিয়নাথ পত্রলোচনের হাত চেপে ধরলেন। পত্রলোচনকে ওঁর বিপর্যস্ত বলে মনে হচ্ছিল। মনে হচ্ছিল, এই অসহায় মানুষটা কোনও চাপা বেদনায় কষ্ট পাচ্ছে।

'লোচনবাবু, আমি কিন্তু আপনার বন্ধু—শত্রু নই। আজ সন্ধের মুখে ওই মাঠে আমি যা দেখেছি সেটা সোজা কথায় একটি হত্যাকাণ্ড—খুন। একটা খুন চোখের সামনে দেখে কোনও মানুষ চুপ করে থাকতে পারে না। যদি আমরা মুখ বুজে থাকি তা হলে আগামী দিনে আরও প্রাণ যাবে। অনেক নিরীহ মানুষ মারা পড়বে। আপনি না এখানকার জমিদার! এখানকার রাজা! আপনার শরীরে না মুকুন্দ রায়ের রক্ত! আপনি কি চান আপনার প্রজারা একে-একে খুন হোক? নিরীহ প্রজাদের জন্যে রাজার কোনও কর্তব্য নেই! ছিঃ-ছিঃ!'

প্রিয়নাথের ধিক্কারে কিছুক্ষণ মাথা নীচু করে বসে রইলেন পত্রলোচন। তারপর কান্না মেশানো গলায় বললেন, 'আমি যে কী করি! আমি যে কী করি! একদিকে আমার বাপ-ঠাকুরদা, আর একদিকে আমার প্রজারা...।'

'যাতে প্রজাদের ভালো হয় তাই করুন—কারণ, বাপ-ঠাকুরদা মারা গেছেন। প্রজারা এখনও বেঁচে আছে।'

পত্রলোচন মাথা নীচু করে ফুঁপিয়ে কাঁদছিলেন। প্রিয়নাথ ওঁর পিঠে একটা হাত রেখে আবার বললেন, 'প্লিজ, আপনার প্রজাদের বাঁচান। আপনার বাপ-ঠাকুরদা স্বর্গে গেছেন, কিন্তু প্রজারা? ওরা তো এখনও আপনার সঙ্গে রয়েছে!'

'আমার বাপ-ঠাকুরদা স্বর্গে যায়নি। ওরা আছে পাতালে—আমার জমিদারিতে—এখানকার মাটির নীচে।' পত্রলোচন মুখ তুলে তাকালেন আকাশের দিকে। চাঁদের আলোয় দেখা গেল ওঁর গালের ওপরে জলের রেখা চিকচিক করছে। মুখ নামিয়ে একটা দীর্ঘশ্বাস ফেললেন। তারপর ঃ 'ওদের শান্ত রাখতেই আমি ওই মন্ত্র পড়ছিলাম। কী বলব আপনাকে, আমার পূর্বপুরুষরা খিদে নিয়ে মারা গেছে...।'

'খিদে নিয়ে মারা গেছে! তার মানে?' প্রিয়নাথ হতবাক।

পত্রলোচন ক্লান্ত গলায় সেই কাহিনি বলতে লাগলেন।

ব্রিটিশ আমলের কথা। তখন ইংরেজের শাসন চলছে। চলছে স্বাধীনতা ফিরে পাওয়ার জন্য বিপ্লবীদের লড়াই। ইংরেজ শাসকরা খবর পেয়েছিল, চারজন উগ্রপন্থী বিপ্লবী এই চপলকেতুতে গা ঢাকা দিয়ে রয়েছে। সেসময়ে এখানে থাকত পত্রলোচনের পূর্বপুরুষরা।

আর গোটা গ্রাম জুড়েই থাকত তাদের নানান আত্মীয়স্বজন।

গোটা গ্রামে তল্লাশি চালিয়েও ইংরেজ পুলিশ সেই চারজনের খোঁজ পায়নি। আর গ্রামের বাসিন্দারা তাদের প্রাণ দিয়ে আড়াল করে রেখেছিল। তখন ক্ষিপ্ত ইংরেজ পুলিশ গোটা গ্রাম ঘিরে ফেলে। গ্রামে খাবারদাবার ঢোকার সমস্ত পথ বন্ধ করে দেয়। সুলতানী আমলে যেভাবে শত্রুপক্ষের দুর্গ অবরোধ করা হত।

চপলকেতুকে এমন নিশ্ছিদ্রভাবে অবরোধ করা হয়েছিল যে, কিছুদিন পরই মানুষগুলো খিদেয় পাগল হয়ে ছুটোছুটি করতে লাগল। এককণা খাবারের সন্ধান পেলে দশ-বিশজন তার ওপরে ঝাঁপিয়ে পড়তে লাগল। মৃতদেহ নিয়ে শকুন কিংবা হায়েনার খেয়োখেয়ি তার কাছে কিছুই না।

দেখতে-দেখতে মানুষগুলো রোগা কঙ্কালসার হয়ে গেল। বেঁচে থাকা অবস্থাতেই ওদের প্রেত বা পিশাচ মনে হত। নানারকম অসুখবিসুখ আঁকড়ে ধরল তাদের। তারপর এমন একটা সময় এল যে, ওরা দিনের আলো আর সহ্য করতে পারত না। তখন বিকেল কি সন্ধের মুখে বেরিয়ে পড়ত খাবারের খোঁজে।

দিন যেতে লাগল। এবং ওরা মরতে লাগল। শ্মশান ছিল অনেকটা দূরে, নদীর ধারে। অবরোধ ডিঙিয়ে সেখানে যাওয়া সম্ভব ছিল না। তা ছাড়া এত দ্রুত মানুষজন মরছিল যে, নিয়ম মেনে দাহ করা সম্ভব হতও না। তাই সমস্ত মৃতদেহ কবর দেওয়া শুরু হল। শেষ পর্যন্ত সেটা গণকবরের চেহারা নিয়েছিল।

ব্যাপারটা ইংরেজ সরকার ধামাচাপা দিয়ে দিয়েছিল। তা ছাড়া এই নৃশংস হত্যালীলার সাক্ষীও কেউ ছিল না। তাই গ্রাম রয়ে

গেল গ্রামের মতো—শুধু লোকগুলো চলে গেল।

যে-কয়েকজন অবরোধ শুরুর আগে গ্রামের বাইরে ছিল, তারা প্রাণে বেঁচে গিয়েছিল। তাদেরই মধ্যে একজন পত্রলোচনের বাবা পুষ্পলোচন সিংহ রায়। ইংরেজের অবরোধ উঠে যাওয়ার পর তিনি এসে জন্মভিটেতে থাকতে শুরু করেন। তাঁর মতো আরও অনেকেই চপলকেতুতে এসে বসবাস শুরু করে। তার কিছুদিন পর লোকজন মাটির নীচের ছুটোছুটি দাপাদাপি টের পায়। এবং সেটা চলতেই থাকে।

একদিন পত্রলোচনের বাবা পুষ্পলোচন বিপদে পড়েন। সন্ধের মুখে মাঠের ওপর দিয়ে হেঁটে যাচ্ছিলেন তিনি। হঠাৎই মাটির নীচ থেকে ছিটকে ওঠে একটা কঙ্কালসার চেহারার অবয়ব। সর্বাঙ্গে তার ধুলোমাটি মাখা। এবং পুষ্পলোচনকে নিয়ে চোখের নিমেষে তলিয়ে যায় মাটির নীচে।

ঘটনাটা ভাগ্যক্রমে গ্রামের দুজন মানুষ দেখতে পেয়েছিল। তাদের কথামতো পত্রলোচনরা তলিয়ে যাওয়ার জায়গাটা চিহ্নিত করেন। তারপর শাবল কোদাল নিয়ে কয়েকদিন ধরে খোঁড়াখুঁড়ি করেন সেখানে। কিন্তু কোনও লাভ হয়নি। পুষ্পলোচনের কোনও চিহ্ন পাওয়া যায়নি।

গ্রামে রটে গেল, পুষ্পলোচনকে পিশাচে ধরেছে।

কেন, পিশাচ কেন? কারণ, সকলের ধারণা হল, খেতে না পেয়ে মারা যাওয়া মানুষগুলো পিশাচ হয়ে গেছে। ওরা এখনও খাবারের খোঁজে পাগলের মতো ছুটোছুটি করছে।

প্রিয়নাথ স্তম্ভিত হয়ে পত্রলোচনের কাহিনি শুনছিলেন।

ভূতশিকারের পেশায় জড়ানোর পর বহু বিচিত্র কাহিনি তিনি শুনেছেন, কিন্তু পত্রলোচনের কাহিনি বেনজির।

ভূতনাথ অবাক হয়ে পত্রলোচনের দিকে তাকিয়ে রইলেন। মানুষটা ওর কাহিনি বলছে আর কাঁদছে। সেই কান্নার ভেতরে পিতৃশোক লুকিয়ে আছে কি না কে জানে!

চাঁদ পশ্চিমে অনেক হেলে পড়েছে। বাতাসে গাছের শুকনো পাতা উড়ছে। তার খসখস শব্দ কেমন একটা অলৌকিক আবহ তৈরি করেছে। এখন মাটির নীচের প্রাণীগুলো কী করছে? ওরা ভূত, প্রেত, না পিশাচ প্রিয়নাথ জানেন না। কিন্তু ওরা যা-ই হোক, ওদের অলৌকিক ক্ষমতার কোনও সীমা নেই। ওরা ইচ্ছে হলে ঘরের দেওয়ালে ছায়া ফেলে দৌড়োয়, ইচ্ছে হলে ওদের অপচ্ছায়া মাঠের ওপরে ছোটাছুটি করে। ওরা পাতাল থেকে ভূমিকম্প তৈরি করে পুকুরের জল নড়ায়। ওরা খোলা মাঠের ওপরে হিমকুয়াশা ছড়িয়ে দেয়।

ওদের মধ্যে রয়েছে পত্রলোচন সিংহ রায়ের পূর্বপুরুষ আর আত্মীয়স্বজন।

প্রিয়নাথের মুখে আজ বিকেলের ঘটনা শোনার পর পত্রলোচন তাদের শান্ত করতে চণ্ডীমণ্ডপে গিয়েছিলেন। চণ্ডীপাঠের মন্ত্রের পর পূর্বপুরুষদের উদ্দেশে মন্ত্র পড়েছেন। এর বেশি পত্রলোচন আর কী-ই বা করতে পারতেন!

প্রিয়নাথ নরম গলায় জিগ্যেস করলেন, 'মাটির নীচে গিয়ে কেউ কখনও ফিরে আসেনি?'

প্রশ্নটা করামাত্রই পত্রলোচন কান্নায় ভেঙে পড়লেন। ওঁর মাথা

ঝুঁকে পড়ল হাঁটুর ওপরে। পিঠটা কান্নায় ফুলে-ফুলে উঠতে লাগল।

প্রিয়নাথ এরকম একটা দৃশ্যের জন্য তৈরি ছিলেন না। তাই অস্বস্তি নিয়ে চুপ করে অপেক্ষা করতে লাগলেন।

কিছুক্ষণ পর পত্রলোচন মুখ তুললেন। জামার হাতায় চোখ ঘষে জল মুছলেন। তারপর একটা লম্বা শ্বাস ফেলে বললেন, 'আমি যতদূর জানি, মাটির নীচে গিয়ে মাত্র দুজন ফিরে এসেছে—।'

'সত্যি?'

'হ্যাঁ। তাদের, স্যার, আপনিও দেখেছেন...।'

'মানে।'

'হ্যাঁ, আমার বউ আর ছেলে।'

চোখে কালো চশমা পরা দুজন মানুষের ছবি পলকে ভেসে উঠল প্রিয়নাথের মনে।

'কী করে ফিরে পেলেন ওদের?'

'মা চণ্ডীর কৃপায়। আমাদের ওই চণ্ডীমণ্ডপ আর বিগ্রহ কম করে দুশো বছরের পুরোনো। ওই মন্দিরের দেবতা খুব জাগ্রত। আদিকাল থেকে আজ পর্যন্ত সবাই ওই দেবীকে খুব মানে। ইংরেজদের অবরোধে যারা মারা গিয়েছিল তারাও মানত। আর আমাদের বংশের সবাই চিরকাল বিপদে-আপদে ওই চণ্ডী-মায়েরই শরণ নিত। ফলে, ওই দেবতাকে আমরা, যারা মাটির ওপরে আছি, তারা যেমন মানি, তেমনই...' একটু থামলেন পত্রলোচন। তারপর বললেন, 'মাটির নীচে যেনারা রয়েছেন তেনারাও মানেন।'

পত্রলোচন ক্লান্ত গলায় বলে চললেন।

একদিন মাঠের ওপর দিয়ে হেঁটে আসার সময় পত্রলোচনের স্ত্রী আর ছেলে দুজনেই তলিয়ে যায়। দুজন ধুলোপিশাচ ছিটকে বেরিয়ে আসে মাটি ফুঁড়ে। এবং দুজনকেই জাপটে ধরে ঢুকে যায় মাটির ভেতরে। ঘটনাটা ঘটেছিল বিকেল-বিকেল সময়ে। তাই পত্রলোচন দু-তিন মিনিটের মধ্যে খবর পেয়ে গিয়েছিলেন।

সঙ্গে-সঙ্গে তিনি ফুল-টুল নিয়ে ছুটে গিয়েছিলেন চণ্ডীমন্দিরে। বুকফাটা হাহাকার নিয়ে কাতর প্রার্থনা শুরু করেছিলেন। স্ত্রী আর ছেলেকে ফেরত পাওয়ার জন্য একটানা আবেদন নিবেদন করেছিলেন পিতৃপুরুষের কাছে।

ওঁর প্রার্থনা নিশ্চয়ই তাঁরা শুনেছিলেন। কারণ, ঘণ্টাখানেকের মধ্যে ওঁর স্ত্রী আর ছেলে ফিরে এসেছিল। পাতাল থেকে ছিটকে বেরিয়ে এসেছিল ওদের ধুলোমাখা দেহ। ওদের সারা গায়ে এত ধুলো মাখা ছিল যে, মানুষগুলোকে ভালো করে ঠাহর করা যাচ্ছিল না। ওরা অজ্ঞান হয়ে পড়ে ছিল মাঠের মধ্যে। চোখ বোজা। দেহ অসাড়।

বাড়িতে নিয়ে এসে সেবাযত্ন করে ওদের সুস্থ করে তোলা হয়। শেষ পর্যন্ত ওরা সেরে উঠেছিল—যদিও একটা ছোট সমস্যা রয়ে গিয়েছিল। চোখে একটু বেশি আলো পড়লে ওদের দেখতে অসুবিধা হয়।

কিন্তু ওরা যে ফিরে এসেছে তাতেই পিতৃপুরুষের প্রতি পত্রলোচনের কৃতজ্ঞতার সীমা-পরিসীমা ছিল না। তাই তিনি চণ্ডীমন্দিরে গিয়ে পিতৃপুরুষের উদ্দেশে পুজো দিয়েছিলেন আবার।

কথা বলতে-বলতে পত্রলোচনের চোখে জল এসে গিয়েছিল। হাতের পিঠ দিয়ে জল মুছে নিয়ে তিনি বললেন, 'স্যার, আমার এই বাপ-দাদার ভিটে ছেড়ে আমি কোথাও যাব না। আর গেলেও আমি শান্তি পাব না। ওঁরা মাটির নীচে যেমন শান্তিতে আছে থাক। আর আমিও মাটির ওপরে যেমন শান্তিতে আছি থাকি। শুধু একটু সাবধান থাকলেই হল।

'স্যার, আর-একটা কথা বলি। আপনারা তো শুধু মানুষ হারিয়ে যাওয়ার খবর পেয়েছেন। এখানে মাঝে-মাঝে গোরু-বাছুর, ছাগল, হাঁস-মুরগি এমনকী কুকুরও হারিয়ে যায়। পাগল করা খিদে পেলে কি আর কোনও বাছবিচার থাকে, বলুন! নিজের বাপ-ঠাকুরদার নামে আমি আর কী নালিশ করব! ওরা আমাকে জন্ম দিয়েছে, আমার বউ-ছেলেকে গ্রাস করেও ফেরত দিয়েছে—আমার আর কী চাই! তাই আমার কাছে সবকিছুই প্রাকৃতিক ঘটনা...।'

কপালে হাত ঠেকিয়ে কাউকে নমস্কার করলেন পত্রলোচন। তারপর হঠাৎই ভূতনাথের হাত চেপে ধরে বললেন, 'স্যার, আমি চাই না এখানে লোকজনের ভিড়ভাট্টা বাড়ুক। এখানে নানান লোকজন আসা-যাওয়া করলে শান্তি নষ্ট হবে। মাটির নীচে যারা আছে তাদের অসুবিধে হবে। তাই আমি চাই, টিভিতে আপনাদের প্রোগ্রাম দেখে লোকজন যেন ভয় পায়। বাইরের কেউ যেন এই চপলকেতুতে আর না আসে। এটাই আপনার কাছে রিকোয়েস্ট, স্যার...।'

পত্রলোচনের আর্তি প্রিয়নাথকে স্পর্শ করল।

সত্যিই তো! পত্রলোচন ওঁর প্রাকৃতিক ঘটনা নিয়ে এই

চপলকেতুতে দিব্যি বেঁচে আছেন। সেইসব ঘটনার তদন্ত করতে আসা মানে সিস্টেমকে ডিসটার্ব করা। প্রিয়নাথ এখানে আসতেনই না—যদি না রমাশঙ্কর দত্তের 'যুক্তিবাদ প্রসার সমিতি' ঝঞ্ঝাট তৈরি করত। আবার না এলে চপলকেতু প্রিয়নাথের পুরোপুরি অজানা থেকে যেত।

প্রিয়নাথ এখানে এসে এই দেড়দিনে অনেক কিছু অনুভব করেছেন, অনেক কিছু নিজের চোখে দেখেওছেন। কিন্তু প্রমাণ? প্রমাণ কই? রমাশঙ্কর দত্তের মুখ কী করে বন্ধ করবেন তিনি? পত্রলোচনের কাছ থেকে এ পর্যন্ত যা-যা জেনেছেন, শুনেছেন সেগুলো রমাশঙ্করকে বললে তিনি কি বিশ্বাস করবেন?

না, প্রিয়নাথের সে নিয়ে সন্দেহ আছে।

চাঁদ পশ্চিমে আরও ঢলে পড়েছে। আর ঘণ্টাখানেকের মধ্যেই হয়তো ভোরের আলো ফুটবে। দূরে চোখ মেলে একটা কুয়াশার মেঘ দেখতে পেলেন। মাটির কাছাকাছি ভেসে আছে।

পত্রলোচনের হাত ধরে উঠে দাঁড়ালেন প্রিয়নাথ। বললেন, 'লোচনবাবু, এবার বাড়িতে যান। রাত ভোর হতে চলল। আপনি মন খারাপ করবেন না।'

পত্রলোচন একটা লম্বা শ্বাস ফেলে উঠে দাঁড়ালেন। ওঁর নিশ্বাসের বাতাসে অনেক দুঃখ-কষ্টের বাষ্প বেরিয়ে এসে হাওয়ায় মিশে গেল।

'আপনি চিন্তা করবেন না। রমাশঙ্করবাবুকে আমি সামাল দেওয়ার চেষ্টা করব। তবে সব কথা ওঁকে খুলে বলতেই হবে। নইলে আমাকে ঠগ, প্রতারক, ফেরেববাজ বলে ভাববেন। আর

উনি যেরকম জঙ্গি মেজাজের লোক, হয়তো ভেবেই বসবেন টাকাপয়সা কিংবা অন্য কিছু নিয়ে আপনার সঙ্গে আমি সমঝোতা করে নিয়েছি...।'

পত্রলোচন ক্লান্তভাবে মাথা নেড়ে সিঁড়ির ধাপে পা রাখলেন। বিড়বিড় করে বললেন, 'কাল সকালে আপনারা আমার এখানে চা খেতে আসবেন কিন্তু—।'

'হ্যাঁ, আসব। আর মিস্টার দত্তের কেসটা দেখছি কী করা যায়। তবে কথা দিচ্ছি, চপলকেতুর ব্যাপারটা আমরা আমাদের মধ্যেই রাখব। অ্যাট লিস্ট যতটা সম্ভব।'

প্রিয়নাথ বাড়ির পিছনদিকে যাওয়ার পথ ধরলেন। ঘরে গিয়ে যতটুকু পারা যায় ঘুমিয়ে নিতে হবে। চোখ বেশ জ্বালা করছে।

এগারো

চোখ জ্বালার চেয়েও বড় জ্বালা প্রিয়নাথের জন্য অপেক্ষা করছিল।

পত্রলোচনের কথাগুলো ভাবতে-ভাবতে বিভোর হয়ে গিয়েছিলেন। একইসঙ্গে গায়ে কাঁটা দিয়েছিল। চোখের সামনে থেকে 'শিকার' ধরার দৃশ্যটাকে কিছুতেই সরাতে পারছিলেন না।

ধুলোমাটির আকস্মিক বিস্ফোরণ। সর্বাঙ্গে ধুলোমাখা একটা পিশাচের বুলেটের মতো ছিটকে বেরিয়ে আসা। তারপর একলাফে শিকারকে আঁকড়ে ধরা। এবং অনায়াসে তিরবেগে মাটি ভেদ করে পাতালে ঢুকে পড়া।

হঠাৎই মুখে টর্চের আলো এসে পড়ল।

'মিস্টার জোয়ারদার, এত রাতে কোথায় বেরিয়েছিলেন?' রমাশঙ্কর দত্ত। পরনে স্যান্ডো গেঞ্জি আর লুঙ্গি।

প্রিয়নাথ থতোমতো খেয়ে গেলেন। হতচ্ছাড়া লোকটা এখন জেগে রয়েছে কেন? কী জবাব দেবেন ওঁকে।

'বলবেন না যেন আবার যে, ভূত ধরতে বেরিয়েছিলেন...' ব্যঙ্গ করে হাসলেন যুক্তিবাদী। টর্চের আলো সরিয়ে নিলেন।

'হুঁ। বলতে পারেন খানিকটা তাই। কিন্তু প্লিজ, এখন ভীষণ টায়ার্ড লাগছে। একটু ঘুমিয়ে নিই। কাল সকালে আপনার সঙ্গে ব্যাপারটা নিয়ে ডিটেলে ডিসকাস করব।'

প্রিয়নাথের আত্মসমর্পণের ঢং দেখে রমাশঙ্করের ব্যঙ্গের ছুরির ধার কিছুটা কমল। ভূতনাথের দিকে কয়েক পা এগিয়ে এলেন ঃ 'এখানে এসে থেকে তো অনেক ডিসকাস করলাম, কিন্তু প্রমাণ কই? ভূত-প্রেতের এগজিস্টেন্স নিয়ে আপনি কোনও প্রমাণ কিন্তু এখনও দিতে পারেননি! তাঁরা যে আছেন তার সায়েন্টিফিক লজিক, প্রুফ—এসব কোথায়?' একটু হেসে বললেন, 'আমি কিন্তু সহজে ছাড়ছি না। আই ওয়ান্ট প্রুফ। আদারওয়াইজ মিস তেওয়ারিকে বলুন "তেনারা যেখানে আছেন"-এর স্লটে অন্য কোনও সিরিয়াল-টিরিয়ালের ব্যবস্থা করতে...।'

প্রিয়নাথ লোকটার হাত থেকে রেহাই চাইছিলেন। তাই বললেন, 'ঠিক আছে। কাল কথা হবে।'

রমাশঙ্কর পেটে হাত বোলাচ্ছিলেন, ছোট-ছোট চাপড় মারছিলেন। হঠাৎই শব্দ করে একটা ঢেঁকুর তুললেন ঃ 'ওঃ,

উইন্ডের প্রবলেমটা বড্ড ভোগাচ্ছে। কিছুতেই ঠিকঠাক ঘুম হচ্ছে না। এখানে এসে থেকে খাওয়াদাওয়ার নিয়মটা একেবারে ঘেঁটে গেছে। যাকগে, মিস্টার জোয়ারদার, তা হলে কাল কথা হবে—।'

প্রিয়নাথ ঘরে ঢোকার আগে একটু চাপা গলায় ওঁকে বললেন, 'আপনি শুনেছেন কি না জানি না, আজ বিকেলে—মানে কাল বিকেলে—একজন লোক খোলা মাঠের ওপর থেকে উধাও হয়ে গেছে...।' বলেই ঘরে ঢুকে গেলেন।

কিন্তু কানে এল রমাশঙ্করের মন্তব্য ঃ 'যত্ত সব বোগাস ব্যাপার!'

*

সেই সব বোগাস ব্যাপারগুলো ধীরে-ধীরে বলছিলেন প্রিয়নাথ। মিংকি আর রমাশঙ্কর শুনছিলেন। সামনের ছোট টেবিলে খালি চায়ের কাপ। পত্রলোচন চুপচাপ বসে হাতপাখা নাড়ছেন, অতিথিদের হাওয়া করছেন।

আজ সকালে চায়ের আসরে প্রিয়নাথ যখন গতকাল বিকেলের 'অ্যাক্সিডেন্ট'-এর কথা আর পত্রলোচনের পারিবারিক কাহিনি বলতে শুরু করেছেন তখন থেকেই পত্রলোচন চুপচাপ হয়ে গেছেন। নির্বিকার মুখে প্রিয়নাথের কথা শুনছেন।

মিংকি চোখ বড়-বড় করে শুনছিল। ভীষণ ভয় করছিল ওর। আজ চপলকেতু ছেড়ে কলকাতা রওনা হতেই হবে! ছুটন্ত পায়ের

শব্দ আর মানুষজনের উধাও হওয়ার পিছনে এরকম মর্মান্তিক ইতিহাস!

কথা বলতে-বলতে বিষণ্ণতা প্রিয়নাথকে ঘিরে ধরেছিল। পত্রলোচনকে দেখে ভীষণ অসহায় বলে মনে হচ্ছিল। কত কী সয়েছে মানুষটা! এখনও সইছে। ওর বউ আর ছেলে আর একটু হলে ওই সর্বনাশা খিদের শিকার হচ্ছিল! বলতে গেলে ভাগ্যবলে মানুষটা ওদের আবার ফিরে পেয়েছে।

প্রিয়নাথের বলা শেষ হলে কিছুক্ষণ সবাই চুপচাপ। দরজা দিয়ে রোয়াক আর তার পরে খোলা জমি দেখা যাচ্ছিল। সকাল থেকে মেঘলা বলে রোদের দেখা নেই।

এখন সবে সকাল ন'টা। তৃষ্ণা, বিনোদকুমার টাটা সুমো নিয়ে এখনও আসেনি। ওরা এলে পর প্রিয়নাথ এখান থেকে পাততাড়ি গোটানোর কাজ শুরু করবেন। চপলকেতু চপলকেতুর জায়গায় থাক।

হঠাৎই রমাশঙ্কর জোরালো গলায় অট্টহাসি হেসে উঠলেন। হাসতেই থাকলেন।

কিছুক্ষণ পরে হাসি থামলে দু-হাত শূন্যে তুলে চিৎকার করে বললেন, 'আপনারা ভেবেছেন কী! সবাই মিলে আমাকে বুদ্ধু বানাবেন? বেড়ে মজা, না! আপনাদের এসব আজগুবি নক্কা-ছক্কা আমি এখনই ফাঁস করছি—' কথা বলতে-বলতে লাফিয়ে উঠে দাঁড়ালেন। দরজার দিকে আঙুল তুলে চিৎকার করে বললেন, 'ওই মাঠ। ওই মাঠের নীচে পিশাচ আছে! যত্ত সব ব্লাফবাজি! পূর্বপুরুষ না হাতির মাথা! এখুনি সব প্রমাণ হয়ে যাবে...।'

রমাশঙ্কর আচমকা ছুট লাগালেন দরজার দিকে। ওঁর পায়ের ধাক্কায় চায়ের টেবিল দড়াম করে উলটে পড়ল। সব কাপ-প্লেট ছিটকে পড়ল মেঝেতে। কয়েকটা ভেঙে চৌচির হয়ে গেল।

রমাশঙ্কর ততক্ষণে দরজা পেরিয়ে সিঁড়ি নেমে পৌঁছে গেছেন খোলা জমিতে।

পত্রলোচন উঠে দাঁড়িয়ে তাড়াতাড়ি পা চালালেন দরজার দিকে। প্রাণপণে চেঁচিয়ে বলতে লাগলেন, 'স্যার, যাবেন না! যাবেন না!'

প্রিয়নাথ হঠাৎ দেখলেন, এত চিৎকার-চেঁচামেচি শুনে কখন যেন কালো চশমা পরা দুজন মানুষ অন্দরের দরজা খুলে বসবার ঘরে ঢুকে পড়েছে।

পত্রলোচনের পিছু-পিছু প্রিয়নাথ এবার ছুটে গেলেন। ওঁর পিছনে মিংকিও।

রমাশঙ্কর দত্ত তখন খোলা মাঠে পাগলের মতো ছুটে বেড়াচ্ছেন আর 'কোথায়? কিছুই তো নেই!', 'ব্লাফমাস্টার', 'জোচ্চোর', এসব বলে চেঁচিয়ে গালমন্দ করছেন।

'স্যার, ফিরে আসুন! ফিরে আসুন!' পত্রলোচন চিৎকার করছিলেন। খোলা জমিতে নেমে রমাশঙ্করকে লক্ষ্য করে ছুটছিলেন।

প্রিয়নাথের মনে হল রমাশঙ্কর বোধহয় সত্যি-সত্যি পাগল হয়ে গেছেন। মিংকি বারবার জিগ্যেস করছে, 'ভূতনাথদা, ওঁর কী হয়েছে? কেয়া হুয়া উনকো?'

পত্রলোচনের পিছনে প্রিয়নাথ আর মিংকিও ছুটতে শুরু করেছিল। রমাশঙ্করের পাগলামি তখনও একটুও কমেনি।

ঠিক তখনই ওঁর কাছ ঘেঁষে মাটি ছিটকে উঠল শূন্যে। উঠল মাটির ফোয়ারা। এবং ধুলোপিশাচ।

এবং পরমুহূর্তেই রমাশঙ্কর ঢুকে গেলেন মাটির ভেতরে। মাটি আবার সমান। আগের মতো। খোলা মাঠের দিকে তাকালে মনে হবে এখানে সবকিছু শান্তি কল্যাণ হয়ে আছে।

মিংকি ডুকরে কেঁদে উঠল। প্রিয়নাথ দৌড়োনো থামিয়ে মাথায় হাত রাখলেন। আর পত্রলোচন হতাশায় বসে পড়লেন মাঠের মাঝখানে।

ওঁরা যখন কী করবেন ভেবে পাচ্ছেন না, তখনই মাঠে আর-একটা ধুলোর বিস্ফোরণ। একটা দেহ ছিটকে বেরিয়ে এল শূন্যে। তারপর মাঠের ওপরেই আছড়ে পড়ল।

চিৎকার করে সেই দেহ লক্ষ্য করে ছুট লাগাল মিংকি। চেতনা ফিরে পেয়ে পত্রলোচন আর প্রিয়নাথও ছুটলেন।

ধুলোমাখা যে-শরীরটা পত্রলোচনের পূর্বপুরুষরা ফিরিয়ে দিয়েছেন সেটা তখন অজ্ঞান অসাড়—অসহায়ভাবে পড়ে আছে খোলা মাঠের ওপরে।

তিনজনে মিলে ধরাধরি করে রমাশঙ্করকে পত্রলোচনের বাড়িতে নিয়ে এলেন। মেঝেতে শুইয়ে দিয়ে ওঁর চোখে-মুখে জলের ঝাপটা দেওয়া হল।

প্রায় কুড়ি মিনিটের চেষ্টায় রমাশঙ্করের জ্ঞান ফিরল। ধুলোর জন্যে চোখ খুলতে পারছিলেন না। বারবার বলছিলেন, 'চোখ জ্বালা করছে।'

পত্রলোচন বললেন, 'ধীরে—ধীরে...ছটফট করবেন না। আপনার

কপাল খুব ভালো যে, তেনারা আপনাকে নেওয়ার সঙ্গে-সঙ্গেই ফেরত দিয়ে দিয়েছেন—' বলে কপালে হাত ঠেকালেন পত্রলোচন। বোতল থেকে জল নিয়ে রমাশঙ্করের চোখে জলের ছিটে দিয়ে চললেন। রমাশঙ্করের জামাকাপড় জলে ভিজে গিয়েছিল।

ওঁর গলার তেজ অনেক কমে গেছে। বোধহয় এখনও শকটা পুরোপুরি কাটিয়ে উঠতে পারেননি। কিন্তু তা সত্ত্বেও জেদি গলায় বললেন, 'সব বাজে কথা। আমি...আমি...হঠাৎ অজ্ঞান হয়ে...গিয়েছিলাম। আমার...আমার কাছে...বুজরুকি চলবে না। প্রমাণ চাই, প্রমাণ । প্রমাণ ছাড়া...আমি মানব না...।'

কথাগুলো বলতে-বলতে রমাশঙ্কর দত্ত অনেক চেষ্টায় চোখ খুললেন।

সঙ্গে-সঙ্গে মিংকি তেওয়ারি ভয়ে চিৎকার করে উঠল। প্রিয়নাথের শরীর কাঠ হয়ে গেল। এ কী প্রমাণ দেখছেন তিনি!

পত্রলোচন তখন কাঁদছেন আর কপাল চাপড়াচ্ছেন।

রমাশঙ্কর দত্তের চোখের মণি দুটো গাঢ় সবুজ। ধকধক করে জ্বলছে। রাতের আঁধারে বেড়াল কিংবা প্যাঁচার চোখ যেমন জ্বলে।

মুর্খ রমাশঙ্কর তখনও বলে চলেছেন, 'কী মিস্টার জোয়ারদার, প্রমাণ কোথায়, প্রমাণ?'

প্রিয়নাথ উত্তর না দিয়ে মুখটা একপাশে ঘুরিয়ে নিলেন। এরকম জ্বলন্ত প্রমাণ তিনি সত্যি-সত্যি চাননি।

ঘরের এককোণে পত্রলোচনের বউ আর ছেলে চুপচাপ দাঁড়িয়েছিল। সেদিকে একবার তাকিয়ে পত্রলোচন কান্না ভাঙা গলায় বললেন, 'এইরকম আগুনঝরা চোখের জন্যেই তো আমার

বউ, আমার ছেলে, সবসময় কালো চশমা পরে থাকে। এটাই তো ওদের চোখের অসুখ...আমার বাপ-পিতামোর দান। হে ভগবান!'

মিংকি কাঁদছিল তখনও।

আর রমাশঙ্কর নিস্তেজ গলায় জেদি সুরে একঘেয়েভাবে আওড়ে চলেছেন, 'প্রমাণ চাই। প্রমাণ চাই। প্রমাণ ছাড়া আমি কিছুই মানতে পারব না। কিছুতেই না...।'

প্রিয়নাথ ভাঙা হতাশ গলায় মিংকিকে বললেন, 'মিংকি, ওঁকে একটা আয়না দেখাও—।' তারপর উঠে দরজার কাছে চলে গেলেন। বাইরের বিষণ্ণ দিনের দিকে তাকালেন।

মেঘলা আকাশ থেকে বৃষ্টি শুরু হয়েছে। মাটি ভিজতে শুরু করেছে।

একটা গাড়ির ইঞ্জিনের আওয়াজ শোনা গেল।

তারপরই পিছন থেকে রমাশঙ্কর দত্তের চিৎকার শোনা গেল। ওঁর বুকফাটা আর্ত হাহাকারে পত্রলোচনের ঘরের বাতাস কাঁপতে লাগল।

জন্ম ২২ অক্টোবর ১৯৫১, কলকাতায়। স্কুলের পড়াশোনা ঃ হিন্দু স্কুল। সাম্মানিক পদার্থবিজ্ঞানে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের স্নাতক এবং ফলিত পদার্থবিজ্ঞানে বি. টেক., এম.টেক. ও পিএইচ.ডি.। পেয়েছেন বিশ্ববিদ্যালয়ের দুটি স্বর্ণপদক ও একটি রৌপ্যপদক।

পত্র ভারতী প্রকাশিত বই **তেইশ ঘণ্টা ষাট মিনিট, ভয়পাতাল, অন্তরে পাপ ছিল, কিশোর কল্পবিজ্ঞান সমগ্র, বিশ্বের সেরা ভয়ংকর ভূতের গল্প, অশরীরী অলৌকিক, ভৌতিক অলৌকিক, বারোটি রহস্য উপন্যাস, সেরা সায়েন্স ফিকশন সমগ্র, পাই নিয়ে রূপকথা, রোমাঞ্চকর ধূমকেতু** ইত্যাদি।

প্রধান নেশা—রহস্য-গোয়েন্দা, অলৌকিক ও কল্পবিজ্ঞান কাহিনি লেখালেখি, জনপ্রিয় বিজ্ঞানচর্চা এবং বিজ্ঞান গবেষণা।

পুরস্কার ঃ প্রাচীন কলাকেন্দ্র সাহিত্য (১৯৯৮) ও ড. জ্ঞানচন্দ্র ঘোষ জাতীয় (১৯৯৯)।

সম্পাদনা করেছেন অল্পকালজীবী কয়েকটি মাসিক পত্রিকা।

প্রচ্ছদ **দেবযানী রায় ঘোষাল**

আচমকা উধাও হয়ে যাওয়া মানুষজন যাচ্ছে কোথায়? পুকুরের জল হঠাৎ-হঠাৎ দুলে ওঠে কেন? বাতাসে কেন ভেসে বেড়ায় অপদেবতার নিশ্বাস?...

অদ্ভুত বিষয় নিয়ে লেখা অদ্ভুত এক ভয়ের উপন্যাস

INR 120.00
B55244
RBKDGJYWNDAANMJH
Dekha Jay Na, Shona Jay ; E